হুমায়ূন আহমেদের

প্রেমের গল্প

প্রেমের গল্প বলতে যা বুঝায় আমি সে রকম গল্প লিখতে পারি বলে মনে হয় না। একটা ছেলে একটা মেয়েকে বলছে " আমি তোমাকে ভালবাসি" এটা আমার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হয়। তারপরেও এ ধরনের গল্প যে লিখিনি তা-না, তবে সেইসব গল্প অতিপ্রাকৃত ধরনের। পাথরের সঙ্গে প্রেম, মূর্তি বা ছায়ামূর্তির প্রতি গাঢ় অনুরাগের গল্প। পাঠক যখন প্রেমের গল্প পড়তে চান তখন মানব-মানবীর সম্পর্কের গল্পই পড়তে চান। কাজেই আমার গল্প পড়ে হয়তবা ভুড়ু কুচকাবেন। কি আর করা ? আমি যা পেরেছি, তাই লিখেছি। য়া পারি না, তা কি করে লিখব ?

"আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিন্।
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি,
আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ, মৌনমাধুরীধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা॥"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিমন্ত্রণ)

সূচি

সুখী মানুষ / ৯
পাথর / ২০
অতিথি / ৪৯
রূপা / ৫৫
কল্যাণীয়াসু / ৬১
একটি নীল বোতাম / ৭৪
দ্বিতীয় জন / ৮১
একজন ক্রীতদাস / ৯১
শাদা গাড়ি / ৯৬
বীণার অসুখ / ১০৪
শঙ্খমালা / ১১৪
অচিন বৃক্ষ / ১১৮
নিশিকাব্য / ১২৭
শ্যামল ছায়া / ১৩৫
ভালোবাসার গল্প / ১৪২
নন্দিনী / ১৫০
গোপন কথা / ১৫৫

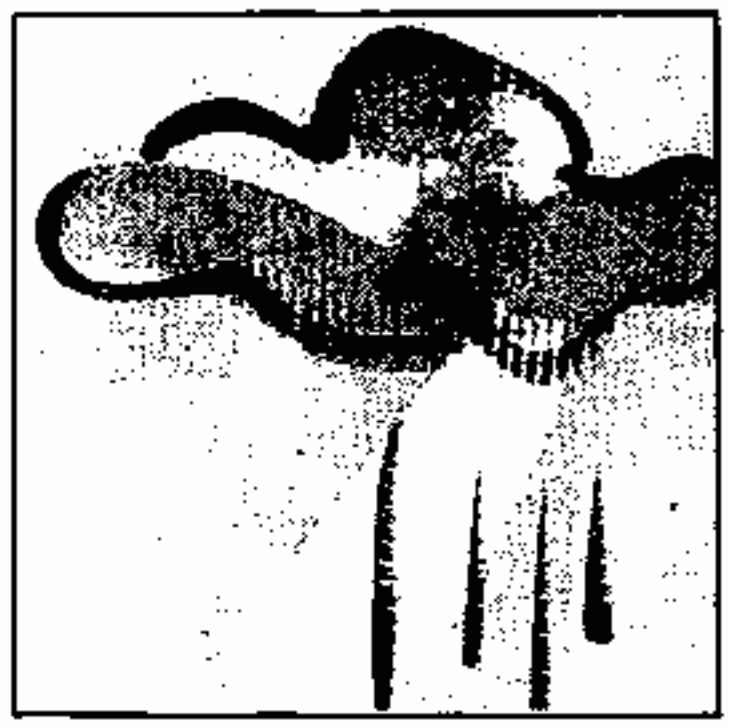

সুখী মানুষ

মানুষ যেমন পোশাক বদলায়, আব্দুল কুদ্দুস বদলায় নাম। রাগ করে যে বদলায় তা না, বিপদে পড়ে বদলায়। দীর্ঘদিন এক নামে চলাফেরা করা তার জন্যে বিপদজনক। গত এক মাস ধরে আব্দুল কুদ্দুসের নাম আলফ্রেড গোমেজ। এই প্রথম সে খ্রিস্টান নাম নিয়েছে। নামের সঙ্গে লেবাসে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কালো সুতোয় বাঁধা রূপার একটা ক্রুশ গলায় ঝুলিয়েছে। কোটের পকেটে মথি লিখিত সুসমাচার নামের চটি একটা বই। খ্রিস্টানরা কথাবার্তায় বিনয়ী হয়–সে বিনয়ী হবার চেষ্টা করছে। চেষ্টা তেমন সফল হচ্ছে না। ফট করে রাগ উঠে যাচ্ছে।

আব্দুল কুদ্দুস অর্থাৎ আলফ্রেড গোমেজ সাহেবের পেশা পাথরের মূর্তি বেচাকেনা। যেখানে বৎসরে একটা মূর্তি বেচতে পারলেই হয় সেখানে সে চার-পাঁচটার মতো মূর্তি বিক্রি করে ফেলে। আগে তার প্রধান খদ্দের ছিল আমেরিকান সাহেবরা এখন জাপানিরা। জাপানিদের সঙ্গে ব্যবসা করার অনেক যন্ত্রণা। তারা মূর্তির ছবি দেখে সন্তুষ্ট না। তাদেরকে জিনিস দেখাতে হয়। সেই জিনিস তারা যে দেখেই সন্তুষ্ট হয় তা না, নানানভাবে হাতাপিতা করে। শিরিষ কাগজের মতো সবুজ রঙের কাগজে মূর্তি ঘসাঘসি করে। তারপর সেই কাগজ বড় সাইজের ক্যালকুলেটরের মতো যন্ত্রে ফেলে দেয়। যন্ত্রের ভেতর থেকে কটকট কটকট করে শব্দ হবে। কী সব লেখা বের হবে। তারপর এমনভাবে মাথা নাড়তে থাকবে যেন আব্দুল কুদ্দুস নকল মাল গছিয়ে দিতে এসেছে। মাছি তাড়াবার মতো ভঙ্গি করে বলবে—নো নো। নো ডিল। ইউ গো।

কাস্টমারদের এইসব অভিনয় কুদ্দুস খুব ভালো বোঝে। সে সঙ্গে সঙ্গে তার জিনিসপত্র গুটিয়ে ফেলে। কাপড়ের ব্যাগে 'মাল' সামলে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়ায়। হাসি মুখে বলে 'ওকে বাই'। বলেই দাঁড়ায় না। দরজার দিকে হাঁটা দেয়। জাপানি খদ্দের তখন ব্যস্ত ভঙ্গিতে কুদ্দুসের চেয়েও খারাপ ইংরেজিতে বলে–এটা ছাড়া তোমার কাছে আর কী আছে? কুদ্দুস বলে, আরো আছে তবে তোমাদের সঙ্গে কোনো বিজনেস আমি করব না। তোমরা আসল নকল বোঝ না।

'অন্য মালামাল কী আছে দেখি।'

'না আপনাদের কিছু দেখাব না।'

এই বলে কুদ্দুস অপেক্ষা করে না, লম্বা পা ফেলে বের হয়ে আসে। গরজ তার না, গরজ সাহেবদের। ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে। গলি তস্য গলি পার হয়ে উপস্থিত হবে শাহ সুরী রোডে। এটা কুদ্দুসের অপছন্দ। সাহেব সুবোরা তার বাড়িতে আসা-যাওয়া করলে লোকজনের চোখ পড়বেই। চোখ কপালে তুলে ভাববে–বিষয়টা কী? এই বাড়িতে এত সাহেবের আনাগোনা কেন?

মূর্তি বেচাকেনার ব্যবসাটা কুদ্দুসের পছন্দ। রিস্ক আছে তবে বড় রিস্ক না। বাংলাদেশের মানুষ মূর্তি নিয়ে মাথা ঘামায় না। পত্রপত্রিকায় মাঝে মধ্যে ভিতরের পাতায় সংবাদ ছাপা হয় তা 'দেশের অমূল্য সম্পদ পাচার' খুবই ফালতু। এই জাতীয় খবরে কেউ মাথা ঘামায় না। যে দেশের মানুষই পাচার হয়ে যাচ্ছে, সে দেশে মূর্তি পাচার কোনো ব্যাপারই না। মূর্তির দাম নিশ্চয়ই মানুষের চেয়ে বেশি না।

আব্দুল কুদ্দুস পর্যটনের হোটেলের একটা কামরায় চুপচাপ বসে আছে। মেঝেতে চেয়ারের পাশে ক্যাম্বিসের সবুজ রঙের পেট মোটা ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর প্রথমে টাওয়েল তারপর খবরের কাগজ এবং পলিথিন দিয়ে মোড়া 'জিনিস'। কুদ্দুসের মুখোমুখি বসে আছে চশমাপরা বাঙালি এক ভদ্রলোক। ব্যবসায়িক লেনদেন সে করবে এটা বোঝা যাচ্ছে। আব্দুল কুদ্দুস সামান্য শংকিত–এই বাঙালি বাবু কমিশন কত খাবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ইশারা ইঙ্গিতে যদি লোকটাকে বলা যেত যে কমিশন দেয়া হবে তাহলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকা যেত। টেন পারসেন্ট কমিশন। যত বেশি দামে বিক্রি হবে তত কমিশন। এইসব ক্ষেত্রে দালালরা দাম বাড়াতে সাহায্য করে। চশমাপরা লোকটাকে হাতে রাখতে পারলে ভালো হত। তেমন সুযোগ এখনো হয় নি। মূল খদ্দের টয়লেটে ঢুকেছে

এখনো বের হচ্ছে না। একটু পরপর বাথরুম থেকে ফ্ল্যাশ টানার শব্দ আসছে। সাহেবের বাংলাদেশী খাবার খেয়ে পেট নেমে গেছে কি-না কে জানে? ওরস্যালাইন চলছে? চশমা পরা এসিসটেন্ট ওরস্যালাইন এনে দিচ্ছে না কেন?

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বললেন, আমার নাম জুবায়ের খান। যে হাতটা বাড়িয়েছেন সেই হাতেই জ্বলন্ত সিগারেট। হ্যান্ডসেক করতে গেলে সিগারেটের ছ্যাঁকা খাওয়ার সম্ভাবনা। কুদ্দুস বিরস মুখে জুবায়ের খানের আঙুলগুলি শুধু স্পর্শ করল।

কুদ্দুস গম্ভীর গলায় বলল, আমার নাম আলফ্রেড গোমেজ।

'আপনি খ্রিস্টান?'

'জ্বি।'

'মূর্তি কেনাবেচার ব্যবসা কতদিন ধরে করছেন?'

কুদ্দুসের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মুখ বাঁকিয়ে কী বিশ্রী ভঙ্গিতেই না প্রশ্নটা করেছে! যেন কুদ্দুস বাংলাদেশের সবচে বড় চোর। দেশের অমূল্য সম্পদ পার করে দেশকে শেষ করে দিচ্ছে। আর সে মহা সাধু। কুদ্দুস মনে মনে বলল—তুই যতদিন ধরে দালালি করছিস আমার ব্যবসা ততদিনের।

'স্যাম্পল এনেছেন?'

কুদ্দুস হ্যাঁ না কিছুই বলল না। সে লক্ষ করল হঠাৎ তার রাগ উঠে গেছে।

'স্যাম্পল কী এনেছেন আমাকে দেখান।'

কুদ্দুস বলল, যে কিনবে সে দেখুক। আপনি দেখে কী করবেন?

'আগে আমি দেখব। আমি দেখে যদি 'ইয়েস' বলি তবেই স্যার দেখবেন। মূর্তির কোয়ালিটি তার প্রাইস এইসবে আমার সামান্য অভিজ্ঞতা আছে।'

কুদ্দুস নিতান্ত অনিচ্ছায় তার ক্যাম্বিসের ব্যাগ খুলল। মোটা টাওয়ালে জড়ানো মূর্তি বের করল। ভদ্রলোক ঝুঁকে এলেন। শুকনো গলায় বললেন—কী মূর্তি?

কুদ্দুস বলল, কি মূর্তি তা জানি না। আমি আপনার মতো এক্সপার্ট না। মেয়ে মানুষের মূর্তি এইটা বলতে পারি। হিন্দুদের কোনো দেবী টেবি হবে। এদের তো কয়েক লক্ষ দেবী। কয়েক লক্ষ দেবীর একজন।

'উহুঁ, কোনো দেবী মূর্তি না। অপ্সরাদের মূর্তি হতে পারে। রম্ভা, মেনকা। স্যার ইন্টারেস্টেড হবেন বলে মনে হয় না।'

'কেন ইন্টারেস্টেড হবে না, মূর্তি খারাপ?'

'বেশিদিন আগের মূর্তি না। কাট দেখেই বোঝা যাচ্ছে বয়স পাঁচশ বছরের বেশি না। পাথরের গ্রেইন বড় বড়। দাম কত চান?'

'ডলারে দাম বলব ন বাংলাদেশী টাকায় বলব?'

'ডলারেই বলুন।'

'দশ হাজার ডলার।'

'বলেন কী?'

জুবায়ের খান চোখ কপালে তুলে ফেলল। কুদ্দুস বলল, আপনার জন্যে দশ পারসেন্ট কমিশন আছে। দশ হাজার ডলারে আপনি পাবেন এক হাজার।

'আমার কমিশনের কোনো দরকার নাই। পাঁচশ টাকার এই জিনিসের দাম দশ হাজার ডলার এমন কথা আমার পক্ষে স্যারকে বলা সম্ভব না। তাও মূর্তি যদি কষ্টিপাথরের হত একটা কথা হত।'

কুদ্দুস বলল, তাহলে আর কি উঠি। বলতে বলতে সে তোয়ালে দিয়ে মূর্তি জড়িয়ে ফেলল। আর তখন জাপানি সাহেব ঘরে ঢুকলেন। জুবায়ের হরবড় করে কী যেন বলল। জাপানি ভাষা। বাঙালি ছেলের মুখে জাপানি ভাষা শুনতে অদ্ভুত লাগে। উত্তরে জাপানিও কিছুক্ষণ কিচকিচ করল। জুবায়ের কুদ্দুসের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার মূর্তি দেখতে চাচ্ছে।

কুদ্দুস উদাস গলায় বলল, দেখে কী হবে?

জুবায়ের বলল, দেখে কিছুই হবে না। স্যার যদি এক হাজার ডলারেও এই মূর্তি কিনতে চায় আমি নিষেধ করব। তবু দেখতে চাচ্ছে দেখান।

কুদ্দুস টাওয়েল সরাল। সাহেব কাছে এগিয়ে এলেন। আবারো কিছুক্ষণ কিচকিচ করলেন।

জুবায়ের বলল, স্যার বলছেন মূর্তি দেখতে খারাপ না, তবে ঠোঁট ভাঙা। এই দেখেন নিচের ঠোঁটের একটা অংশ ভাঙা।

কুদ্দুস দেখল। আসলেই ভাঙা। পুরানো আমলের এইসব জিনিসের মূল্য ভাঙা থাকলেই বাড়ে। তারপরেও খুঁততো বটেই। কেনার সময় আরো দেখে শুনে কেনা উচিত ছিল। তবে ঠোঁট ভাঙার কারণে মূর্তিটা দেখতে খারাপ লাগছে না। কুদ্দুস এই মূর্তি আগে ভালোমতো দেখেনি। এই প্রথম দেখছে। যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। পাথরের মূর্তি বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে জীবন্ত কোনো মেয়ে। যে-কোনো কারণে লজ্জা পেয়েছে বলে চোখের দৃষ্টি হঠাৎ নত হয়েছে। গাল হয়েছে ঈষৎ লাল। খুবই আনমনা মেয়ে।

জুবায়ের বলল, স্যার দাম জানতে চাচ্ছেন।

'দামতো বলেছি।'

'সেতো কথার কথা। এখন ঠিক দাম বলেন। ক্যাশ পেমেন্ট হবে। জাপানিরা

অল্প কথার মানুষ। এক হাজার ডলার অনেক বেশি হয়ে যায়। তারপরেও আপনি কষ্ট করে এসেছেন স্যারকে এক হাজার ডলার বলে দেখি। রাজি হবে বলে মনে হচ্ছে না।

কুদ্দুস মূর্তি তার ব্যাগে ভরে ফেলল। ব্যাগ কাঁধে নিতে নিতে বলল–যা বলেছি বলেছি। আপনার স্যার যেমন এক কথার মানুষ। আমিও সে রকম এক কথার মানুষ।

'আপনি কি ফিক্সড প্রাইস শপ খুলেছেন না-কি?'

'জ্বি ফিক্সড প্রাইস।'

সাহেব আবারো কিচকিচ করা শুরু করেছে। তার কিচকিচানির মধ্যে একধরনের উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। একবার মনে হল জাপানি ভাষায় জুবায়েরকে ধমকও দিলেন। তারপর কুদ্দুসের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন 'সিট ডাউন।'

কুদ্দুস বসল। মনে হচ্ছে বাণিজ্য হবে। পুরানো আমলের জিনিস একবার কারো মনে ধরে গেলে বিপদ আছে। একবার মনে ধরা মানে বড়শিতে গেঁথে যাওয়া। সেই বড়শি থেকে বের হওয়া অতি কঠিন। সাহেব কি বড়শিতে গেঁথেছে? মনে হয় গেঁথেছে।

মূর্তিটা বিক্রি করা কুদ্দুসের জন্যে অতি জরুরি। গত এক বছরে সে কিছুই বিক্রি করতে পারেনি। হাসমত একটা বিষ্ণুমূর্তি এনে দেবে বলে সত্তর হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছিল। হাসমতের কোনো খোঁজ নেই। লোকমুখে শুনেছে সে মূর্তি ঠিকই জোগাড় করেছে, বিক্রি করেছে অন্য জায়গায়। কুদ্দুসের বিরাট সংসার। চার ছেলেমেয়ে স্ত্রী। তার দুই শালাও তার সঙ্গে বাস করে। দেশে টাকা পাঠাতে হয়। এক বোন সম্প্রতি বিধবা হয়েছে। তাকেও টাকা পয়সা দিতে হয়। শুধু টাকা দিয়ে মনে হয় পার পাওয়া যাবে না। এই বোনও তার সংসার নিয়ে কুদ্দুসের বাসায় উঠবে। আজ মূর্তিটা বিক্রি করতে পারলে হত।

জুবায়ের বলল, স্যার বলছেন মূর্তিটা বের করতে।

কুদ্দুস মূর্তি বের করল। আগে মনে হচ্ছিল মূর্তির মেয়েটা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করেছে। এখন মনে হচ্ছে তা-না। মেয়েটা রাগ করে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। খুবই তুচ্ছ কোনো কারণে রাগ করেছে। কিছু কিছু মেয়ে আছে রেগে গেলে চোখে পানি এসে যায়, এই মেয়ে সেই জাতের। এখনি হয়ত কেঁদে ফেলবে।

জুবায়ের বলল, আপনার দাম শুনে স্যার প্রায় ভিরমি খেয়েছেন। যাই হোক স্যার একটা দাম বলেছেন। এর বেশি একটা পয়সাও দেবেন না। ক্যাশ ডিলিং

হবে। আপনি মূর্তি রেখে যাবেন, ডলার পকেটে ভরবেন। স্যার বলছেন সর্বমোট চার হাজার ডলার।

কুদ্দুস অতি দ্রুত চিন্তা করছে। চার হাজার ডলার খারাপ না। ভালো। বেশ ভালো। ডলারে একান্ন টাকা করে পাওয়া যাচ্ছে। চার হাজার গুনন একান্ন–কত হয়? দুই লাখ চার হাজার। এই মূর্তির পেছনে তার খরচ হয়েছে খুবই সামান্য এগারো হাজার টাকা। লাভ এক লাখ তিরানব্বই। খারাপ না, ভালো।

জুবায়ের বলল, চুপ করে আছেন কেন? কিছু বলেন।

'কী বলব?'

'স্যার একটা প্রাইস বলেছেন। হ্যাঁ-না, কিছু বলেন।'

কুদ্দুস মূর্তির দিকে একঝলক তাকাল। ধ্বক করে বুকে ধাক্কার মতো লাগল। মূর্তি মেয়েটা মনে হয় কথাবার্তা শুনছে। তাকে নিয়ে দরদাম করা হচ্ছে–মেয়েটা যে চোখ নিচু করে আছে এই লজ্জাতেই নিচু করে আছে।

জাপানি কিচকিচ করে ইঁদুরের মতো কীসব যেন জুবায়েরকে বলছে। হাত নাড়ছে। হাত নেড়ে কথা বলার অভ্যাস হল বাঙালির অভ্যাস। মাঝে মাঝে বিদেশীদের মধ্যেও এই অভ্যাস দেখা যায়।

'আলফ্রেড গোমেজ সাহেব।'

'জ্বি।'

'স্যারের সঙ্গে লাস্ট কথা হয়েছে। উনি আজ রাতের ফ্লাইটে চলে যাচ্ছেন। সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনস। উনি সময় নষ্ট করতে চান না। আরো পাঁচশ ডলার ধরে দিয়েছেন। আশা করি এর পরে আর কোনো আপত্তি থাকার কথা না।'

কুদ্দুস উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, মূর্তি বেচব না।

জুবায়ের বলল, গোমেজ সাহেব আপনি একটা ভুল করছেন, স্যার সামান্য আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে আপনি ভেবে নিচ্ছেন স্যারের খুবই গরজ। উনার এত গরজ নাই। দরাদরি উনি খুবই অপছন্দ করেন বলেই ঝামেলা কমাবার জন্যে পাঁচশ টাকা এক্সট্রা দিতে চেয়েছেন। আমি নিজে বাঙালি। বাঙালি চরিত্র আমি ভালো জানি। আপনি হোটেল থেকে এক পা বের হয়ে আবার ফিরে আসবেন তখন কিন্তু আমরা পাঁচশ ডলার কম দেব। এটা মনে রাখবেন। আপনি যেমন ত্যাঁদড় আমিও ত্যাঁদড়।

কুদ্দুস ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমি ফিরে আসব না।

হোটেলের বাইরে কুদ্দুসের পোষা বেবিটেক্সি। বিজনেসে বের হলে কুদ্দুস সবসময় সারাদিনের জন্য একটা বেবিটেক্সি নিয়ে নেয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত

ঘুরবে পাঁচশ টাকা। সন্ধ্যার পর কুদ্দুস হল ফ্যামিলি ম্যান। দুই ছেলেমেয়েকে পড়ায়। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ছবি দেখে। অনেকগুলি চ্যানেল ফ্যানেল হওয়ায় খুব সুবিধা হয়েছে–বোতাম টিপলেই কোনো না কোনো ছবি পাওয়া যাবেই। সবই খুব সস্তা ধরনের ছবি। তবু বিনা পয়সায় দেখা যাচ্ছে–খারাপ কি? মাগনার সব জিনিসই ভালো। মাগনা আমার ভাগনা। ভাগ্নের সবই ভালো।

বেবিটেক্সিতে ওঠার সময় কুদ্দুস দেখল জুবায়ের সাহেব হোটেলের সিঁড়িতে চলে এসেছেন। তাঁর মুখ অসম্ভব বিরক্ত। তিনি হাত ইশারায় কুদ্দুসকে ডাকলেন। বেবিটেক্সিওয়ালা বলল, স্যার আপনারে ডাকে। কুদ্দুস উদাস গলায় বলল, ডাকুক। তুমি চালাও।

আজকের বাণিজ্যটা হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে তার জন্যে কুদ্দুসের মোটেও খারাপ লাগছে না। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল তাতে তো মনে হচ্ছিল মূর্তিটা হাতছাড়াই হয়ে যাবে। দশ হাজারে রাজি হয়ে গেলে–কুদ্দুসের হ্যাঁ বলা ছাড়া উপায় ছিল না। তেমন টাকা পেলে মানুষ তার স্ত্রী পুত্র বেচে দেয় আর এতো সামান্য মূর্তি।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হল মিলিয়েছে। কুদ্দুস তার বাসার বারান্দায় বসে আছে। এই জায়গাটা তার অতি প্রিয়। যদিও প্রিয় হবার মতো কিছু নেই। ফ্ল্যাট বাড়ির বারান্দাগুলি যেমন হয়–এক চিলতে জায়গা, একটা চেয়ার বসালে মানুষ হাঁটার জায়গা থাকে না। তারচেয়েও ভয়াবহ কথা হল বারান্দা থেকে আকাশ দেখা যায় না–পাশের ফ্ল্যাটের দেয়াল দেখা যায়। কুদ্দুসের নিজের কিছু ট্রাংক বারান্দায় রাখা। বালিশসহ একটা পাটি পাতা আছে। চিকের পর্দা টেনে বারান্দায় শুয়ে আরামের ঘুম দেয়া যায়। ছেলেমেয়েদের চিৎকার হৈ চৈ কিছুই কানে আসে না।

বারান্দায় বাতি জ্বলছে। কুদ্দুসের হাতে চায়ের কাপ। তার পাশেই পাটিতে মূর্তিটা শোয়ানো। কুদ্দুস তাকিয়ে আছে মূর্তিটার দিকে। কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। সে খুব অস্বস্তিও বোধ করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি তার স্ত্রী আমেনা এসে উঁকি দেবে। খুটখাট শব্দ হওয়া মাত্র কুদ্দুস চমকে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। যদিও এই চমকানোর কোনোই মানে হয় না। আমেনা এসে দেখলেও কিছুই যায় আসে না। এমনতো না যে তার পায়ের কাছে সত্যি কোনো মেয়ে লজ্জা লজ্জা চোখে শুয়ে আছে। পাথরের মূর্তি। পাথরের মূর্তি তার কাছে থাকতেই পারে। তার ব্যবসাই মূর্তি নিয়ে।

তারপরেও এমন অস্বস্থি লাগছে কেন? মূর্তিটা বার বার হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করছে। পাথরের মূর্তি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখা কোনো ব্যাপার না। তাছাড়া মূর্তির

গায়ে ধুলাবালি আছে। ধুলাবালি পরিষ্কার করার জন্যেও গায়ে হাত দেয়া যায়। কুদ্দুস হাতের চায়ের কাপ নামিয়ে মূর্তিটা কোলে নিল। পরিষ্কার করতে হবে। আর তখনি বারান্দার দরজার দিকে আমেনা আসছে এমন শব্দ পাওয়া গেল। কুদ্দুস অতি দ্রুত টাওয়েল দিয়ে মূর্তি ঢেকে ফেলল। আশ্চর্যের ব্যাপার তার কপালে সামান্য ঘামও জমে গেল।

'কী করছ?'

'চা খাচ্ছি আবার কি করব?'

'তোমার কোলে কি?'

কুদ্দুস বিরক্ত গলায় বলল, কিছু না। মেয়েদের অতিরিক্ত কৌতূহল তার কাছে অসহ্য লাগে। তার কোলে কি তা দিয়ে আমেনার দরকার কি? সে তো মেয়ে মানুষ কোলে নিয়ে বসে নেই। এই জাতীয় বদচিন্তা সে কখনো করে না। পুরুষ মানুষের অনেক বদঅভ্যাস থাকে। আজে বাজে জায়গায় যাওয়া, লাল পানি খাওয়া। তার কোনোটাই কুদ্দুসের নেই। তারপরেও এত সন্দেহ। কেমন চোখ সরু করে বলছে— তোমার কোলে কি? আবার চলেও যাচ্ছে না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার কাছে কে যেন এসেছে।'

'আসছি। একটা সার্ট এনে দাও।'

আমেনা সার্ট আনতে গেল। এই ফাকে অতি দ্রুত কুদ্দুস মূর্তি সামলে ফেলল। টাওয়েল দিয়ে ঢেকে ব্যাগের ভেতর পাচার। ভালো একটা তালা আজই কিনতে হবে। ব্যাগে তালা দিয়ে রাখতে হবে। মূর্তি নিয়ে কুদ্দুস যখন বের হয় তখন ব্যাগে তালা থাকে না। তালা মানেই সন্দেহ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তালা লাগবে।

বসার ঘরে শুকনো মুখে জুবায়ের খান বসে আছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। এই গরমেও স্যুট পরে এসেছে। কুদ্দুসকে ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল না, নড়ে চড়ে বসল। কুদ্দুস বলল, আপনি বাসা চিনলেন কি ভাবে ? ঠিকানা কোথায় পেয়েছেন ?

জুবায়ের খান বিরক্ত গলায় বলল, জোগাড় করেছি। কি ভাবে জোগাড় করেছি সেই লম্বা স্টোরি বলার সময় নেই। আমি আপনার টাকা নিয়ে এসেছি মূর্তিটা প্যাক করে দেন।

'কি মূর্তি?'

'কি মূর্তি মানে? আজ সকালে যেটা নিয়ে হোটেলে গিয়েছিলেন।'

'ও আচ্ছা।'

'যা চেয়েছেন তাই নিয়ে এসেছি। দশ হাজার। ট্রেভেলার্স চেকে পেমেন্ট হবে। অসুবিধা নেই তো?'

'জ্বি না অসুবিধা নাই।'

'বসে আছেন কেন? যান 'মাল' নিয়ে আসুন। আমার হাতে সময় নেই। স্যারের রাতের ফ্লাইট।'

'চা খাবেন?'

'না চা খাব না। এক গ্লাস পানি খেতে পারি। ফুটন্ত পানি আছে তো?'

'আছে, ফুটন্ত পানি আছে।'

'যান ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি নিয়ে আসুন। আর মূর্তিটা আনুন।'

কুদ্দুস ঘরে ঢুকল। পানি নিয়ে ফেরত এল। পানির গ্লাস টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, ছোট্ট একটা সমস্যা হয়েছে। মূর্তিটা আমার সঙ্গে নাই।

'সঙ্গে নেই মানে?'

'এইসব জিনিস তো সাথে নিয়ে ঘুরি না সবসময় সামলায়ে রাখতে হয়।'

'যেখানে সামলে রেখেছেন সেখান থেকে নিয়ে আসুন। চলুন আমি সঙ্গে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে কোন অসুবিধা নেই।'

'মূর্তি চলে গেছে রাজশাহী।'

'রাজশাহী চলে গেছে মানে কি?'

'আমার পার্টনার সকালবেলা নিয়ে চলে গেছে। ইন্ডিয়াতে পাচার হবে। দেবদেবীর দেশ তো। ওদের এইসব জিনিসের আলগা কদর। পূজার ঘরে রেখে পূজা-টূজা করে।'

'গোমেজ সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি ঠিক করে বলুন তো। আপনি কি মোচড় দিয়ে জিনিসটার দাম বাড়াতে চাচ্ছেন? সত্যি করে বলুন। আমি না হয় স্যারের সঙ্গে মোবাইলে টেলিফোন করে আরো কিছু দেব।'

'সত্যি কথা বলছি। ক্রশ ছুঁয়ে বলছি। কোন খ্রিস্টান ক্রশ ছুঁয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারে না।'

কুদ্দুস হল বালিশ ঘুম টাইপ মানুষ। বালিশে মাথা ছোয়ানো মানেই ঘুম। আজ রাতে কি যে হয়েছে কুদ্দুস বিছানায় গড়াগড়ি করছে। ঘুম আসছে না। ফ্যানের

বাতাসে গরম লাগছে। বিছানা থেকেও মনে হয় গরম ভাপ আসছে। একটু পর পর পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। যতবার সে পানি খেতে উঠছে ততবারই ঘুম ঘুম গলায় আমেনা বলছে— কে? আমেনার খুবই সজাগ ঘুম। সামান্য কাশির শব্দেও সে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে বলবে—কে কাশে? আমেনার ঘুম একটু যদি গাঢ় হত তাহলে সে বারান্দায় চলে যেত। ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে মেয়েটাকে বের করত। মেয়েটাকে খুবই দেখতে ইচ্ছা করছে। কুদ্দুসের কাছে খুব খারাপও লাগছে। সে দিব্যি ফ্যানের নিচে আরামে বিছানায় শুয়ে আছে অথচ আরেকজন...শেষরাতে মানুষের ঘুম গাঢ় হয়। আমেনারও নিশ্চয়ই গাঢ় ঘুম হবে। তখন বারান্দায় চলে গেলেই হবে। মেয়েটাকে খুবই দেখতে ইচ্ছা করছে। কুদ্দুস বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে শেষ রাতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

পাঁচ বছর পরের কথা।

আব্দুল কুদ্দুস আবারো নাম পাল্টেছে। এখন তার নাম মুনশি হাবীবুল্লাহ। নামের সঙ্গে চেহারা এবং পোষাক পরিবর্তন করতে হয়, সেটাও করা হয়েছে। দাড়ি রেখেছে। মাথায় নেপালীদের রঙ্গিন টুপি। গায়ে ফতুয়া এবং পাঞ্জাবির মাঝামাঝি জাতীয় একটা পোষাক। মূর্তির ব্যবসাতেই সে আছে। বেশ জুড়ে সুড়েই আছে। ব্যবসা বেড়েছে। এখন ইন্ডিয়া থেকেও 'মাল' আসে। তাকে সারা বছরই ব্যস্ত থাকতে হয়। আজ রাজশাহী, পরশু দিনাজপুর। কাজের সুবিধার জন্যে একজন ফুল টাইম এসিসটেন্ট রেখেছে। ইংরেজিতে এম.এ. পাশ চৌকস ছেলে। চোখে মুখে কথা বলে। বিদেশী ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ সেই করে। এর মধ্যেই জাপানিদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে জাপানি ভাষা শেখার চেষ্টা করছে। হীরের টুকরা ছেলে। ঘরে বড় মেয়ে থাকলে জামাই করে রাখার মত ছেলে।

ক্যাশ টাকা আব্দুল কুদ্দুসের কখনো হাতে থাকে না, তবে এ বারে সে ক্যাশ টাকা আটকে ফেলেছে। ঝিকাতলায় এক হাজার স্কয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছে। ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকার জন্যে ফ্ল্যাটটা খুবই ছোট সে জন্যেই হয়তবা আব্দুল কুদ্দুস একাই মাঝে মধ্যে এসে ফ্ল্যাটে থাকে। সুন্দর করে সাজানো ফ্ল্যাট। টিভি আছে, ফ্রিজ আছে। বসার ঘরে সোফা সেট। শোবার ঘরে ডবল খাট, ড্রেসিং টেবিল। মেঝেতে কার্পেট। বারান্দায় বেতের দুলুনি চেয়ার।

আব্দুল কুদ্দুস তার ফ্ল্যাটে কখনো দিনে দুপুরে আসে না। রাত আটটা-নটা, মাঝে মাঝে তারো পরে উপস্থিত হয়। মাথায় চাদর দিয়ে রাখে বলে তার মুখও পরিষ্কার দেখা যায় না। ফ্ল্যাটের লিফট এখনো চালু হয়নি বলে তাকে হেঁটে হেঁটে সিঁড়ি ভেঙ্গে সাত তলায় উঠতে হয়। এই সময় তার খুব চেষ্টা থাকে কেউ যেন

তাকে ঠকিয়ে না ফেলে। যেন নিজের ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকাটা ভয়ংকর নিষিদ্ধ ধরনের কোন অন্যায়।

চাবি খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকেই আব্দুল কুদ্দুসের মন ভাল হয়ে যায়। অনেক সময় নিয়ে নিজেই ঘর ঝাঁট দেয়, পালকের ঝাড়ন দিয়ে সোফার ধুলা ঝাড়ে। রান্নাঘরে ঢুকে চা বানিয়ে চা খায়। রাত আরো গভীর হলে শোবার ঘরে ঢুকে। তখন তার গা ছমছম করতে থাকে। অদ্ভুত রোমাঞ্চ হয়। বক্সখাটের ড্রয়ার থেকে কাঁপা কাঁপা হাতে সে তার ক্যাম্বিসের ব্যাগটা বের করে। এই সময় তার বুক ধ্বক ধ্বক করতে থাকে। মনে হয় এই বুঝি সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। মূর্তিটার দিকে তাকানোর পরই একটা শান্তি শান্তি ভাব আসে। মনে হয় এই পৃথিবীতে তারচে সুখী মানুষ কেউ নেই।

নির্জন ফ্ল্যাট বাড়িতে শুধু সে এবং তার অতি প্রিয় একজন। সারারাত সে যদি সেই প্রিয় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলেও কারোরই কিছু বলার নেই।

আব্দুল কুদ্দুস জানে তার ভয়ংকর কোনো অসুখ করেছে। যত দিন যাচ্ছে অসুখটা ততই বাড়ছে। পৃথিবীর সব অসুখেরই কোনো না কোনো চিকিৎসা আছে, এই অসুখেরও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে চায় না এই অসুখের চিকিৎসা হোক। বরং সে উল্টোটা চায়। সে চায় অসুখটা আরো বাড়ুক। তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলুক।

মূর্তিটার জন্যে আব্দুল কুদ্দুস আজ একটা উপহার নিয়ে এসেছে। পাথর বসানো গলার হার। সে খুব যত্ন করে হারটা মেয়েটাকে পরাল। তারপর ফিস ফিস করে প্রায় জড়ানো গলায় বলল— জান সোনা গো! হারটা পছন্দ হয়েছে?

এই কথাগুলি বলতে গিয়ে তার চোখে পানি এসে গেল। তার কাছে মনে হল এই পৃথিবীতে সে সবচে সুখী মানুষ।

পাথর

'চিত্রা মা, চা-টা উপরে দিয়ে আয়তো।'

চিত্রা বারান্দায় বসে নখ কাটছিল। বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের একটা নখ ভেঙ্গেছে, ভাঙ্গা নখ 'রিপেয়ার' করা সহজ ব্যাপার না। তার সমস্ত মনযোগ সেই নখে। নখটা এমনভাবে কাটতে হবে যেন ভাঙ্গাটা চোখে না পড়ে। চিত্রা মা'র দিকে না তাকিয়েই বলল, দেখছ না মা একটা কাজ করছি।

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, কাজটা এক মিনিট পরে করলে হয় না ?

চিত্রা বলল, হয় না। উপরে চা নিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমার কাজটা অনেক বেশি জরুরী। তা ছাড়া উপরে চা নিয়ে যেতে আমার ভাল লাগে না।

সুরমা অবাক হয়ে বললেন, কেন ?

'জোবেদ চাচা সারাক্ষণ জ্ঞানের কথা বলেন। পড়া জিজ্ঞেস করেন। ইংলিশ ট্রানস্লেশন জিজ্ঞেস করেন। আমার অসহ্য লাগে।'

'তুইতো তাঁর সঙ্গে বেশ হাসিমুখেই কথা বলিস।'

'আমি সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলি। অপছন্দের মানুষদের সঙ্গে আরো বেশি হাসি মুখে বলি, যাতে তারা বুঝতে না পারে আমি খুব চমৎকার অভিনেত্রী। যাদের সঙ্গে আমি খারাপভাবে কথা বলি— বুঝতে হবে তাদের আমি খুব পছন্দ করি। যেমন তুমি।'

সুরমা বিরক্ত মুখে চায়ের কাপ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সকাল বেলার এই কাজের সময়ে চিত্রার বকবকানি শোনার কোন অর্থ হয় না। মেয়েটার কথাবার্তা কাজ কর্মের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। বারান্দায় বসে নখ কাটছে। কাটা নখ ছড়িয়ে থাকবে— সে উঠে চলে যাবে।

চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। সুরমা উপরে পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না। কাজের মেয়েটার জ্বর এসেছে। সে কাথামুড়ি দিয়ে কোঁ কোঁ করছে। রশীদকে পাঠিয়েছেন বাজারে। এক কাপ চা উপরে পাঠানোর লোকের অভাবে নষ্ট হবে ? তাঁর মনটা খুঁত খুঁত করছে। অপচয় তাঁর একেবারেই সহ্য হয় না। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। চা তাঁর পছন্দের পানীয় না। চা খাবার পর মুখ মিষ্টি হয়ে থাকে। মিষ্টি ভাবটা কিছুতেই যায় না।

চিত্রার নখ কাটা শেষ হয়েছে। তার মুখ হাসি হাসি। তার অভিনয়টা ভাল হয়েছে। মা সত্যি সত্যি ধরে নিয়েছেন সে জোবেদ চাচাকে খুবই অপছন্দ করে। সামান্য এক কাপ চাও সে উপরে নিয়ে যেতে রাজি না। অথচ সে ছটফট করছে কারণ এগারোটা প্রায় বাজে এখনো অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে চা নিয়ে উপরে যেতে পারবে। খুব কম করে হলেও এক ঘন্টা কথা বলতে পারবে। চিত্রা রান্নাঘরে ঢুকল। বিরক্ত বিরক্ত মুখ করে বলল —

'মা চা দাও। নিয়ে যাচ্ছি।'

সুরমা গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোকে নিতে হবে না।'

'অন্য একজনের চা তুমি চুক চুক করে খেয়ে ফেলছ আশ্চর্য!'

'শুধু শুধু কথা বলিস নাতো।'

চিত্রা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, মা শোন, আমি এক ঘন্টার জন্যে ছাদে যাচ্ছি। ছাদে হাঁটাহাঁটি করব। এই এক ঘন্টায় কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। আর শোন তুমি আরেক কাপ চা বানিয়ে দাও— আমি জ্ঞানী চাচার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।

'তোকে চা দিয়ে আসতে হবে না।'

'অবশ্যই হবে। না দেয়া পর্যন্ত আমার মনে একটা অপরাধবোধ কাজ করবে। সারাক্ষণ মনে হবে আহা আমার জন্যে বেচারা চা খাওয়া থেকে বঞ্চিত হল। অপরাধবোধ থেকে হবে গিল্ট কমপ্লেক্স। সেখান থেকে জটিল জটিল সব মনের রোগ তৈরি হবে। তারপর একদিন দেখা যাবে আমি ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে গেছি। আমার মাথার ঘিলু চারদিকে ছিটকে পরে আছে। ইত্যাদি। ইত্যাদি।'

'তুই সারাক্ষণ এত কথা বলিস কিভাবে ? ছোট বেলায় তো এ রকম ছিলি না?'

'ছোটবেলায় কি রকম ছিলাম, হাবা টাইপের?'

'আর কথা বলিস না তো।'

'তুমি আমার সামনে থেকে সরোতো মা। আমি চা বানাব। আমার নিজেরো চা খেতে ইচ্ছে করছে। জ্ঞানী চাচার জন্যেও এক কাপ নিয়ে যাব। অপরাধবোধ

থেকে মুক্ত হব। ভাল কথা মা—আমার হাতের কাটা নখগুলি সারা বারান্দায় ছড়ানো—কাউকে দিয়ে পরিস্কার করিও নয়ত তুমিই আমার সঙ্গে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করবে।

'চুপ করতো।'

চিত্রা খিলখিল করে হেসে উঠল। সে চায়ের কাপে চা ঢালছিল। হাসির কারণে চা চারদিকে ছড়িয়ে গেল। ধমক দেয়ার বদলে সুরমা মুগ্ধ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটা এত সুন্দর! পিঠময় চুল ছড়িয়ে সে বসে আছে— ঘর আলো হয়ে আছে। সুরমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। এত সুন্দর হওয়া ভাল না।

'মা!'

'কি?'

'তোমার কি ধারণা—আমাদের জ্ঞানী চাচা বোকা না বুদ্ধিমান?'

'বোকা হবে কেন? এসব কি ধরনের কথা?'

'একমাত্র বোকারাই সারাক্ষণ জ্ঞানীর মত কথা বলে। এই জন্যেই আমার ধারণা তিনি বেশ বোকা।'

'শুধু চা নিয়ে যাচ্ছিস কেন বিসকিট নিয়ে যা।'

'আমি বিসকিট ফিসকিট নিতে পারব না।'

চিত্রা চা নিয়ে উঠে চলে গেল। সুরমা গেলেন বারান্দায় ছড়িয়ে থাকা নখ পরিস্কার করতে।

বারান্দা ঝকঝকে পরিস্কার। নখের একটা কণাও কোথাও পড়ে নেই। মেয়েটা কি যে করে। মায়ের সঙ্গেও ফাজলামী। রশীদ বাজার নিয়ে এসেছে। তিনি বাজার তুলতে গেলেন। রশীদকে দিয়ে একটা প্লেটে করে কয়েকটা বিসকিটও উপরে পাঠাতে হবে। কথাটা মনে থাকলে হয়। তাঁর কিছুই মনে থাকে না। বাজার তুলতে তুলতে আসল কথাটাই ভুলে যাবেন। পুঁই শাকের বড় বড় পাতা আনতে বলেছিলেন। এনেছে কি না কে জানে? হয়ত ভুলে বসে আছে। চিত্রার বাবা ইলিশপাতুরি খেতে চেয়েছিলেন। সরিষাও আনা দরকার ছিল। পুরানো সরিষায় তিতকুট ভাব হয়। পাতুরি বানালে জোবেদ সাহেবকে পাঠাতে হবে। ভাল মন্দ রান্নার সময় ভদ্রলোকের কথা মনে হয়— শেষ পর্যন্ত পাঠানো হয় না। আসল সময়ে ভুলে যান। সুরমা'র মনে হল ডায়াবেটিসের সঙ্গে জরুরী বিষয় ভুলে যাবার একটা সম্পর্ক আছে। ডায়াবেটিস ধরা পরার পর থেকে এ রকম হচ্ছে। না আজ জোবেদ সাহেবকে খাবার পাঠাতেই হবে।

জোবেদ আলি সুরমাদের তিন তলা বাড়ির ছাদে থাকেন। ছাদে চিত্রার বাবা আজীজ সাহেব বাথরুমসহ একটা ঘর বানিয়ে ছিলেন। গেষ্ট রুম। গেষ্ট এলে ছাদে থাকবে মূল বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না। মাঝে মাঝে নিজেরাও থাকবেন। বৃষ্টি বাদলার দিনে ছাদের চিলেকোঠায় থাকতে ভালই লাগে। সেই পরিকল্পনা কাজে লাগলো না। আজীজ সাহেবের মাথায় অর্থকরী পরিকল্পনা খেলা করতে লাগল। ছাদের ঘরটা ভাড়া দিলে কেমন হয়। নির্ঝনঝাট টাইপের ভাড়াটে পাওয়া গেলে প্রতি মাসে হেসে খেলে দু'হাজার টাকা পাওয়া যাবে— বছরে চব্বিশ হাজার, দশ বছরে দুইলাখ চল্লিশ হাজার। আজীজ সাহেব এক রুম ভাড়া হবে এমন একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। বর্তমান ভাড়াটে জোবেদ আলি সেই বিজ্ঞাপনের ফসল। ভদ্রলোকের বয়স তিপ্পান্ন। ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। ভাল না লাগায় ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমানে বই পড়া এবং লেখালেখি ছাড়া কিছুই করেন না। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে হাসিমুখে বলেন, যেভাবে বেঁচে আছি এইভাবে আরো দশ বছর বেঁচে থাকার মত অর্থ আমার আছে। দশ বছরের বেশি বেঁচে থাকব বলে মনে হয় না। যদি বেঁচে থাকি তখন দেখা যাবে।

আদর্শ ভাড়াটে বলে যদি পৃথিবীতে কিছু থেকে থাকে জোবেদ আলি তাই। তিনি কোথাও যান না, কেউ তাঁর কাছে আসে না। দুপুর বা মধ্যরাতে হঠাৎ টেলিফোন করে কেউ বলে না—"আপনাদের ছাদে যে ভদ্রলোক থাকেন জোবেদ আলি তাঁকে একটু ডেকে দিন না।" শুরুতে আজীজ সাহেব বলে দিয়েছিলেন— ভাই মাসের দু' তারিখে ভাড়া দিয়ে দেবেন। এক বছর হয়ে গেল জোবেদ আলি তাই করছেন খামে ভর্তি করে কুড়িটা একশ' টাকার নোট দিচ্ছেন। প্রতিটি নোট নতুন। কোন ময়লা নোট বা স্কচটেপ লাগানো নোট তার মধ্যে নেই। ভাড়াটের নানান অভিযোগ থাকে—এই ভদ্রলোকের কোন অভিযোগও নেই। একবার পানির মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিন দিন পানি ছিল না। তিনি কাউকে কিছু বলেন নি। একতলা থেকে বালতি করে পানি এনেছেন। সুরমা দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, একি আপনি পানি তুলবেন কেন? আমার ঘরে তিনটা কাজের মানুষ, বললেই পানি তুলে দেয়। জোবেদ আলি বলেছিলেন— ভাবী, আমি নিজেও একজন কাজের মানুষ। সামান্য এক বালতি পানি উপরে তোলার সামর্থ আমার আছে। যেদিন থাকবে না সেদিন আপনাকে বলব।

আজীজ সাহেব পৃথিবীর কোন মানুষকে বিশ্বাস করেন না, পছন্দও করেন না। তাঁর ধারণা আল্লাহতালা মানুষকে বদ হিসেবে বানিয়েছেন। ভাল যা হয় নিজের

চেষ্টায় হয়— কিছুদিন ভাল থাকার পর আবার নিজের বদ ফরমে ফিরে যায়। সেই আজীজ সাহেবেরও ধারণা—জোবেদ আলি মানুষটা খারাপ না। সুরমা পৃথিবীর সব মানুষকে বিশ্বাস করেন। তাঁর ধারণা জোবেদ আলি মানুষ হিসেবে শুধু ভাল না, অসাধারণ ভাল। শুধু একটু দুঃখি। তাতো হবেই ভাল মানুষরা দুঃখি দুঃখি হয়। ভদ্রলোকের একটা মাত্র মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে চলে গেল ভার্জিনিয়া। বাবা একা পরে রইল দেশে। বাবা এবং মেয়ের আর দেখা হবে কিনা কে জানে? সুরমা একবার কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন— আচ্ছা ভাই স্ত্রী মারা যাবার পর আপনি আবার বিয়ে করলেন না কেন? বিয়ে করলে তো আর এই কষ্টটা হত না। একা একা পড়ে আছেন ভাবতেই খারাপ লাগে।

ভদ্রলোক হাসিমুখে বলেছেন- ভাবী এটা একটা বড় ধরনের বোকামী হয়েছে। ব্যাপারটা আপনাকে বলি– আমার মেয়ের জন্মের পরপর স্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থ অবস্থায় এক রাতে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, শোন তুমি আমাকে একটা কথা দাও, যদি আমি মরে টরে যাই তুমি কিন্তু বিয়ে করতে পারবে না। আমি ঘুমের ঘোরে ছিলাম— বলে ফেললাম, আচ্ছা। বলেই ফেঁসে গেছি। বেচারী তার মাসখানিক পর মারা গেল আমি ঝুলে গেলাম। হা হা হা।

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, হাসছেন কেন? এর মধ্যে হাসির কি আছে?

"ঘুমের ঘোরে একটা কথা বলে কেমন ফেঁসে গেলাম দেখেন না। এই জন্যই হাসছি।'

'ভাই আপনি বড়ই আশ্চর্য লোক।'

'আমি মোটেই আশ্চর্য লোক না ভাবী, আমি খুবই সাধারণ লোক। বেশি সাধারণ বলেই বোধহয় আশ্চর্য মনে হয়।

'আপনার স্ত্রী কি খুব সুন্দরী ছিলেন?'

'সুন্দরী ছিল কিনা বলতে পারছি না, তবে অপুষ্টিজনিত কারণে বাঙ্গালী মেয়েদের চেহারায় একটা মায়া মায়া ভাব থাকে। সেই মায়া ভাবটা ডবল পরিমাণে ছিল এইটুকু বলতে পারি।'

"তাঁর ছবি আছে আপনার কাছে?'

'আমার কাছে নেই। আমার মেয়ের কাছে আছে। মা'র সব ছবি তার কাছে।'

জোবেদ আলির প্রতি মায়ায় সুরমার হৃদয় দ্রবীভূত হল। বারবার মনে হল— ইস মানুষটার জন্যে কিছু যদি করা যেত। যতই দিন যাচ্ছে সেই মায়া বাড়ছে।

চিত্রা চায়ের কাপ হাতে জোবেদ আলি সাহেবের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে আছে। তার কপালে ঘাম। সে এক

ধরনের অস্থিরতা বোধ করছে যে অস্থিরতার কারণটাও তার কাছে ঠিক স্পষ্ট নয়। জোবেদ আলি চৌকিতে বসে আছেন। তাঁর পিঠ দেয়ালে। পরণে লুঙ্গি ও ফুল হাতা সার্ট। ভদ্রলোকের অনেক বিচিত্র অভ্যাসের একটি হচ্ছে ফুলহাতা শার্ট ছাড়া তিনি পরেন না। চিত্রার মনে হল-"ইস ইনাকে কি সুন্দর লাগছে।" এটা মনে হবার জন্যে সে লজ্জিতও হল না, অপ্রস্তুতও বোধ করল না।

অথচ প্রথমদিন মানুষটাকে দেখে খুব রাগ লেগেছিল। বাইরের উটকো একজন মানুষ ছাদের ঘরে পড়ে থাকবে। যখন তখন ছাদে আসা যাবে না। বৃষ্টিতে ছাদে গোসল করা যাবে না। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করা যাবে না। বাবা কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে বলবেন, যা বোঝ না তা নিয়ে তর্ক করবে না। তোমার অভ্যাস হয়েছে তোমার মা'র মত না বোঝে তর্ক।

চিত্রা বাবাকে বলেনি জোবেদ নামের মানুষটাকে কিছু কঠিন কথা শুনাতে গেছে। কঠিন কথাও ঠিক না— অবহেলা সূচক কিছু কথা। যা থেকে মানুষটা ধরে নেবে— এখানে তার বাস সুখকর কিছু হবে না।

লোকটা চেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে বই পড়ছিল এবং পা নাচাচ্ছিল। চিত্রাকে দেখে পা নাচানোও বন্ধ করল না, বই থেকেও চোখ তুললনা। গম্ভীর গলায় বলল, কেমন আছ চিত্রা?

লোকটার পক্ষে তার নাম জানা বিচিত্র কিছু না। নামতো জানতেই পারে। হয়ত কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে। তারপরেও প্রথম আলাপেই পরিচিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা, কেমন আছ চিত্রা, খুবই আশ্চর্যজনক।

'এসো ভেতরে এসো। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুবই অলক্ষণ।'

'অলক্ষণ কেন?'

'প্রাচীন বাংলার বিশ্বাস- যে মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তার ঘরে সুজন ঢুকে না।'

চিত্রা দরজা ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকল। এবং বেশ সহজ ভাবেই চৌকির উপর বসল। জোবেদ আলি নরম গলায় বললেন, পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

"ভাল, শুধু ইংরেজীটা খারাপ হয়েছে।'

'ইংরেজী খারাপ হলে কিছু যায় আসে না। ইংরেজী বিদেশী ভাষা। বাংলাটা ভাল হলেই হল। ইংরেজি খারাপ হওয়া ক্ষমা করা যায়। বাংলা খারাপ হওয়া ক্ষমার অযোগ্য।'

'আমার বাংলাও খারাপ হয়েছে।'

'সেকি?'

'আসলে আমার সব পরীক্ষাই খারাপ হয়েছে। তবে বাসায় কাউকে কিছু বলি নি। বাসার সবাই জানে আমার সব পরীক্ষা ভাল হয়েছে। শুধু ইংরেজীটা একটু খারাপ হয়েছে। আমি যা বলি সবাই আবার তা বিশ্বাস করে। কারণ আমি হচ্ছি খুব ভাল অভিনেত্রী।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'মাঝে মাঝে আমার নিজের অভিনয় দেখে মনে হয় আমি সুবর্ণা মুস্তফার চেয়েও ভাল অভিনয় করি। আমার চেহারাটা যদি আরেকটু মিষ্টি হত তাহলে টিভিতে যেতাম।'

'তোমার চেহারা মিষ্টি না?'

'জ্বি না।'

'বুঝলে কি করে চেহারা মিষ্টি না?'

'আমাকে রাতে কখনো পিপড়ায় কামড়ায় না। আমি মিষ্টি হলে রাতে নিশ্চয়ই পিপড়ায় কামড়াতো।'

জোবেদ আলি হো হো করে হেসে ফেললেন। হাসির উচ্ছ্বাসে তার হাত থেকে বই পড়ে গেল। চিত্রা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তার সামান্য রসিকতায় একটা মানুষ এত হাসতে পারে সে কল্পনাও করেনি। চিত্রা বলল, চাচা আমি যাই। জোবেদ আলি বললেন, অসম্ভব তুমি এখন যেতেই পারবে না। তোমাকে কম করে হলেও আরো পাঁচ মিনিট থাকতে হবে। আসলে আজ সকাল থেকে আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, তোমার সঙ্গে কথা বলে মনটা ভাল হয়েছে। আরেকটু ভাল করে দিয়ে যাও।

চিত্রা বলল, আমি কারোর মন ভাল করতে পারি না। আমি যা পারি তা হচ্ছে মন রাগিয়ে দেয়া। যেই আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সেই রেগে যায়।

'আচ্ছা বেশ তুমি আমাকে রাগিয়ে দিয়ে যাও— দেখি কেমন রাগাতে পার।' তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হল-

চিত্রা পাঁচ মিনিটের জন্যে বসে শেষ পর্যন্ত পুরো এক ঘন্টা থাকল। সে আরো কিছুক্ষণ থাকতো কিন্তু সুরমা রশীদকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। চিত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, এতক্ষণ কি করছিলি ?

চিত্রা বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, মা শোন কাকে আমাদের বাড়িতে এনে ঢুকিয়েছ?

সুরমা বললেন, কেন?

'আমি ভদ্রতা করে দেখা করতে গেলাম উনি আমাকে ইংরেজী ট্রানস্লেশন ধরলেন। তারপর উপদেশ আর বক্তৃতা। অসহ্য। বাবাকে বলে উনাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করবো মা। ঐ লোকের জন্য আমার ছাদে হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল।'

'তুই তোর মত ছাদে যাবি।'

'অসম্ভব! আমি আর ভুলেও ছাদে যাব না।'

আসলে এক অর্থে চিত্রার ছাদে যাওয়ার সেদিন থেকেই শুরু। তারপর এক রাতে সে আশ্চর্য সুন্দর এবং একই সঙ্গে খুবই ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখল। সে দেখল সে হাঁটছে, ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে হাঁটছে। সেই বাচ্চা মেয়েটা জাপানী পুতুলের মত সুন্দর। জোবেদ আলি নামের মানুষটা বাচ্চা মেয়ের অন্য হাত ধরে আছে। সেই মানুষটা বাচ্চা মেয়েটার বাবা, এবং সে মেয়েটার মা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা। কি লজ্জা। তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সারারাত সে জেগে রইল।

নিজেকে মনে হচ্ছিল কুৎসিত একটা পোকা। সারারাত সে একটা পোকার মতই শরীর গুটিয়ে শুয়েছিল। শুয়ে শুয়েই সে ফজরের আজান শুনল। তার মা ঘুম ভেঙ্গে দরজা খুলছেন তাও বুঝল। এবং প্রথমবারের মত মনে হল— মা রোজ এত ভোরে উঠে? আশ্চর্যতো! সে নিজেও বিছানা ছেড়ে নামল। দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দেখে বারান্দার জলচৌকিতে সুরমা নামাজ পড়ছেন। বারান্দার এই অংশটা চিকের পর্দায় ঢাকা। খুব নিরিবিলি।

সুরমা নামাজ শেষ করে বিস্মিত হয়ে বললেন, কি হয়েছে? চিত্রা বলল, কিছু হয়নি। ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

'এত সকালে ঘুম ভাঙ্গল কেন?'

'তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যেন সকালে ঘুম ভাঙ্গাটা অপরাধ।'

'অপরাধ হবে কেন? সকালে ঘুম ভাঙ্গাটাতো খুব ভাল কথা। ফজরের দু'রাকাত নামাজ পড়ে ফেলিস দেখবি সারাটা দিন কত ভাল যাবে। শরীর থাকবে ফ্রেস। আজ থেকে শুরু কর না।'

'সব সময় উপদেশ দিও নাতো মা। অসহ্য লাগে। আজ ভোরবেলায় উঠেছি বলে কি রোজ ভোরবেলায় উঠব? কাল থেকে আবার আগের মত দশটার সময় ঘুম ভাঙ্গব।'

'তুই যাচ্ছিস কোথায়?'

'ছাদে। মর্নিং ওয়ার্ক করব।'

'তোর চোখ এমন লাল দেখাচ্ছে কেন?'

'ভোরবেলা সবার চোখই লাল দেখায়। তোমার চোখও লাল। বাম চোখটা বেশি। ডানটা কম।'

চিত্রা ছাদে উঠে গেল।

আশ্চর্য জোবেদ আলি সাহেব ছাদে হাঁটছেন। তাঁর পরণে ফুল হাতা সার্ট। ধবধবে সাদা লুঙ্গী। সার্টের রঙ খয়েরী। খয়েরী রঙের খানিকটা মুখে এসে পড়েছে। তাঁকে কেমন যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

চিত্রা খুব সহজ ভঙ্গিতে বলল, ছাদে কি করছেন?

জোবেদ আলি বললেন, হাঁটছি।

'আপনি রোজ এত ভোরে উঠেন?'

'না। আজ বাধ্য হয়ে উঠেছি।। দাঁতের ব্যথায় রাতে ঘুম হয়নি। দেখ গাল ফুলে কি হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সের অনেক যন্ত্রণা।'

'দাঁতের ব্যথাটা কি খুব বেশি?'

'এখন একটু কম। সব ব্যথাই দিনে কমে যায়। রাতে বাড়ে ! তুমি কি রোজ এত ভোরে ওঠ?'

'আমি সকাল দশটার আগে কখনো বিছানা থেকে নামি না।'

'আজ নামলে যে ?'

চিত্রা হাসতে হাসতে বলল, কাল রাতে আমার এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। এখন ঘুম পাচ্ছে। ঠিক করেছি ছাদে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে শুয়ে পড়ব।

'কাল রাতে ঘুম হয়নি কেন ?

'সত্যি জানতে চান?'

'জানতে চাই এইটুকু বলতে পারি। সত্যি জানতে চাই, না মিথ্যা জানতে চাই তা বলতে পারি না।'

'কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি কারণ কাল রাতে আমি টের পেলাম একজন মানুষকে আমি প্রচণ্ড রকম ভালবাসি। আপনি কি আমার কথায় অস্বস্তি বোধ করছেন?'

'অস্বস্তি বোধ করব কেন? তোমার বর্তমান সময়টা প্রেমে পরার জন্যে আদর্শ সময়। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয়ে গেছে, কিচ্ছু করার নেই- এই সময় প্রেমে পরবে নাতো কখন পরবে? প্রেমে কি একা একা পরেছ না দু'জন মিলে পরেছ?'

'আপনি এমন ভাবে কথা বলছেন যেন প্রেমে পরাটা খালে পরে যাবার মত।'

'অনেকটা সে রকমই। কেউ কেউ এমন খালে পরে সেখানে হাঁটুপানি। সমস্যা হয় না। খাল থেকে উঠে আসতে পারে। আবার কোন কোন খালে অতলান্তিক পানি। উঠার উপায় নেই। সাঁতার জানলেও লাভ হয় না। কতক্ষণ আর সাঁতার কাটবে ? এক সময় না এক সময় ডুবতে হবেই।'

চিত্রা বলল, 'আবার কোন খালে পানি নেই। শুধুই কাদা। সেই খালে পরা মানে নোংরা কাদায় মাখামাখি হওয়া।'

'ভাল বলেছ। খুব গুছিয়ে বলছ।'

'আপনার সঙ্গে থেকে আর কিছু শিখি বা না শিখি গুছিয়ে কথা বলা শিখেছি।'

'তাওতো কিছু শিখলে। ভালটা মানুষ সহজে শিখতে পারে না। মন্দটা শিখে ফেলে। আমার মন্দ কিছু শেখনি ?'

'আপনার মন্দ কি আছে?'

'অসংখ্য। প্রথম হল আলস্য। আমার মত অলস মানুষ তুমি তিন ভূবনে পাবে না।'

'অলস কোথায়? আপনি দিন রাত বই পড়ছেন। লিখছেন।'

'আলস্যটাকে আড়াল রাখার এ হচ্ছে হাস্যকর একটা চেষ্টা। লোকে ভাববে অনেক কাজ করা হচ্ছে আসলে লবডঙ্গা।'

'লবডঙ্গা কি?'

'লবডঙ্গা হচ্ছে নব ডংকা শব্দের অপভ্রংশ। নব ডংকা মানেতো জানই নতুন ঢোল। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না প্রচন্ড ঢোলের শব্দ হচ্ছে, সবাই ভাবছে না জানি কত কাজ হচ্ছে আসলে ঢোল বাজছে।'

'আমি এখন যাচ্ছি।'

'কি করবে ঘুমুবে?'

'আমার মাথা ধরে আছে। প্রথমে কড়া এক কাপ চা খেয়ে মাথা ধরাটা কমাব তারপর দু'টা ঘুমের অসুধ খেয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবব কি করা যায়।'

'কি করা যায় মানে?'

'একটা মানুষকে যে আমি প্রচন্ড রকম পছন্দ করি তাকে কি করে সেই খবরটা দেয়া যায় তাই ভাবব। আপনিতো খুব জ্ঞানী মানুষ আপনার কি কোন সাজেশান আছে ?'

'তাকে চিঠি লিখ। সুন্দর করে গুছিয়ে চিঠি লেখ।'

'অসম্ভব। আমি চিঠি লিখতে পারব না। - আমার লজ্জা লাগবে।'

'মুখে বলা কি সম্ভব ধর টেলিফোনে জানিয়ে দিলে।'

'না।'

'আমিতো আর কোন পথ দেখছি না।'

'আপনার ধারণা চিঠি লিখে জানানোই সবচে ভাল।'

'হ্যা।'

'তারপর সে যদি সেই চিঠি সবাইকে দেখিয়ে বেড়ায় তখন কি হবে?'

'খানিকটা রিস্কতো নিতেই হবে।'

'আমি চিঠি লিখতে পারি না। আমি ভাল আছি তুমি কেমন আছ এই দু'লাইন লেখার পর আমার চিঠি শেষ হয়ে যায়।'

'তাহলে এক কাজ কর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ধার নাও। রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা কয়েক লাইন লিখে পাঠিয়ে দাও। এমন কিছু লাইন বের কর যাতে তোমার মনের ভাব প্রকাশিত হয়।'

'আমি পারব না। আপনি বের করে দিন।'

লেখ-

'প্রহর শেষের আলোয় রাঙ্গা সেদিন চৈত্রমাস

তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।'

লেখার সময় খেয়াল রাখবে যেন বানান ভুল না হয়। প্রেমপত্রে বানান ভুল থাকা অমার্জনীয় অপরাধ।'

'বানান ভুল হবে না। চিঠি লিখতে না পারলেও আমি বানান খুব ভাল জানি।'

চিত্রা ছাদ থেকে নেমে নিজেই চা বানিয়ে খেল। মা'কে গিয়ে বলল– মা শোন, আমি এখন চারটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুম দেব। খবর্দার আমাকে নাশতা খাবার জন্যে ডাকাডাকি করবে না। আমি একেবারে দুপুরবেলা উঠে ভাত খাব।'

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে হবে কেন?

চিত্রা হাই তুলতে তুলতে বলল, আমি ঠিক করেছি একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়ে মারা যাব। আজ তার একটা রিহার্সেল।

'তুই সব সময় এমন পাগলের মত কথা বলিস না।'

'আমি শুধু পাগলের মত কথাই বলি না, পাগলের মত কাজও করি। মা রশীদকে তুমি আমার ঘরে একটু পাঠাওতো।'

'কেন?'

'কাজ আছে।'

চিত্রা নিজের ঘরে ঢুকে চারটা ঘুমের ট্যাবলেট খেল। তারপর ড্রয়ার থেকে কলম বের করে গোটা গোটা হরফে লিখল-

'প্রহর শেষের আলোয় রাঙ্গা সেদিন চৈত্রমাস।

তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।'

কাগজটা ভাজ করে রশীদের হাতে দিয়ে বলল- 'রশীদ তুই এ কাগজটা জোবেদ চাচার হাতে দিয়ে আয়। এক্ষুনী যা। কাগজটা দিয়ে এসে আমাকে খবর দিবি কাগজ দিয়ে এসেছিস। হাবার মত এরকম হা করে থাকবি না। মুখ বন্ধ কর।'

চায়ের কাপ হাতে চিত্রা দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছে? পাঁচ মিনিট? দশ মিনিট? নাকি তার চেয়েও বেশী। চা সম্ভবত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাই ভাল। জোবেদ চাচা ঠাণ্ডা চা খান। চিত্রা তার জীবনে এই প্রথম একটা মানুষ পেল যে চা ঠাণ্ডা করে খায়। চিত্রা টুক টুক করে দরজায় দু'বার টোকা দিল।

জোবেদ আলি বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, ভেতরে এসো। সাত মিনিট দেরী হল যে ?

'দেরী মানে?'

'আমি জানতাম তুমি আমার ঘরে ঠিক এগারোটার সময় চা নিয়ে আসবে। এখন বাজছে এগারোটা সাত। কাজেই তুমি সাত মিনিট দেরী করেছ।'

'আমি ঠিক এগারোটার সময় আসব আপনাকে কে বলল?'

'আমার সিক্সথ সেন্স বলেছে।'

'উফ কেন যে মিথ্যা কথা বলেন। আপনি কি ভেবেছেন আপনার মিথ্যা কথা শুনে আমি খুশি হব ?'

'আমি যে কথাটা বললাম সেটা যে মিথ্যা না তা কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।'

'বেশতো প্রমাণ করুন।'

'টেবিলের উপরে দেখ একটা বই আছে জীবনানন্দ দাসের কবিতাসমগ্র। বইটার নিচে একটা কাগজ আছে। কাগজটায় কি লেখা আছে পড়।'

চিত্রা কাগজটা নিয়ে পড়ল। কাগজে লেখা–" আমার সিক্সথ সেন্স বলছে চিত্রা ঠিক এগারোটায় আমার জন্যে চা নিয়ে আসবে। আমি চায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। "

'পড়েছ?'

'হ্যাঁ'।

'আজকের তারিখ দেয়া আছে দেখেছ?'

'হ্যাঁ'

"অবাক হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কতটুক অবাক হয়েছ?'

চিত্রা চাপা গলায় বলল, খুব অবাক হয়েছি।

'বিস্ময় অভিভূত ?'

'হ্যাঁ।'

জোবেদ আলি চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাসি মুখে বললেন, এত অল্পতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ো না। পরে সমস্যায় পরবে। সিক্সথ সেন্স টেন্স কিছু না। আমি যা করেছি তা হচ্ছে খুব সাধারণ একটা ট্রিকস। অনেকগুলি কাগজে এই জিনিস লিখেছি শুধু সময়টা একেক কাগজে একেক রকম। তুমি যদি বারটার সময় চা নিয়ে আসতে তাহলে বলতাম জানালার কাছে যে পিরিচটা আছে সেই পিরিচের নিচের কাগজটা দেখ। সেই কাগজে লেখা চিত্রা ঠিক বারটার সময় আমার জন্যে চা নিয়ে আসবে। এখন বুঝতে পারছ?

'এটা কেন করলেন?'

'তোমার বিস্ময়ে অভিভূত করে দেবার জন্যে করলাম।'

'কৌশলটা পরে বলে ফেললেন- বিস্ময়টাতো আর রইল না।'

'কৌশলটা স্বীকার করায় বিস্ময় আরো দীর্ঘস্থায়ী হল। বিস্ময়ের সঙ্গে যুক্ত হল মজা। তাই না?'

'হ্যাঁ'।

'গম্ভীর হয়ে আছ কেন?'

'রাগ লাগছে।'

'রাগ লাগছে কেন?'

'আপনার এত বুদ্ধি আর আমার এত কম। বুদ্ধি এই জন্যে রাগ লাগছে।'

'তোমার বুদ্ধি কম কে বলল?'

'আমি জানি আমার বুদ্ধি কম। আমি মোটর সাইকেলের মত ফটফট করে কথা বলতে পারি কিন্তু আমার বুদ্ধি কম। আমি আমার বুদ্ধি দিয়ে কাউকে বোকা বানাতে পারি না। শুধু মাকে পারি।'

'উনাকে বোকা বানাও?'

'হ্যাঁ মা'র ধারণা আপনাকে আমার একেবারেই পছন্দ না।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমার বুদ্ধি কম হলেও আমি আবার ভাল অভিনয় জানি। আমি নানান ধরনের অভিনয় করে মা'কে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখি। মা'র ধারণা আমি আপনাকে দেখতে পারি না।'

'আসলে পার?'

চিত্রা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। জোবেদ আলি টের পাচ্ছেন মেয়েটি রেগে যাচ্ছে। তিনি রাগ কমানোর চেষ্টা করলেন না। মাথা নীচু করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলেন। চিত্রা বলল, আপনার বই লেখা কেমন এগুচ্ছে?

'ভাল।'

'এখন কি লিখছেন?'

'সৌন্দর্য কি? এই বিষয়ে একটা লেখা?'

'সৌন্দর্য কি?'

জোবেদ আলি হাসি মুখে বললেন, 'তাতো জানি না।'

'যা জানেন না তার উপর লিখছেন কি ভাবে?'

'সৌন্দর্য কি তা যে আমি জানি না সেটাই লেখার চেষ্টা করছি।'

'আপনার কথা বুঝলাম না।'

'সব কথা যে বুঝতেই হবে এমন তো না। কথা না বোঝার মধ্যেও আনন্দ আছে।'

'আমি এখন চলে যাব।'

'আচ্ছা।'

'আমার মনটা খুব খারাপ আপনি আমার মন ভাল করে দিন।'

'মন কি ভাবে ভাল করব তাতো বুঝতে পারছি না। প্রবন্ধ যেটা লিখছি সেটা পড়ে শুনাব?'

'না।'

চিত্রা ওঠে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে বলল, আমি যাচ্ছি। জোবেদ আলি বললেন, এমন রাগী রাগী ভাব করে চলে যেও না তারপর দেখবে নিজেরই খারাপ লাগবে। খানিকক্ষণ বসে মনটা ভাল করে তারপর যাও।

'আমার মন ভাল হবে না।'

'মন ভাল হবার ব্যবস্থা করছি।'

'কি ব্যবস্থা?'

'তোমাকে একটা উপহার দিচ্ছি। উপহার পেলে মেয়েদের মন ভাল হয়।'

'খুব ভুল কথা বলেছেন। মেয়েদের এত ছোট করে দেখবেন না। মেয়েরা উপহারের কাঙ্গাল না।'

'আমি যে উপহার দেব তা পেয়ে তুমি অসম্ভব খুশি হবে তা আমি লিখে দিতে পারি।'

'উপহারটা কি?'

জোবেদ আলি উঠলেন। টেবিলের ড্রয়ার খুলে বেশ বড় সাইজের একটা পাথর বের করে আনলেন। বিশেষত্বহীন পাথর। এইসব পাথর ভেঙ্গেই রেল লাইনে দেয়া হয়। দালান কোঠা তৈরীতে ব্যবহার হয়। এর বেশী কিছু না। চিত্রা আগ্রহী গলায় বলল, 'এই আপনার উপহার?'

'হ্যা।'

'আপনার ধারণা এই পাথর পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হব?'

'হ্যাঁ হবে। কারণ এই পাথরে কিছু লেখা আছে।'

'কি লেখা?'

চিত্রা গভীর আগ্রহে পাথর হাতে নিল। কোন লেখা দেখতে পেল না। সারা পাথরের গায়ে বল পয়েন্টে অসংখ্য গুণ চিহ্ন আঁকা।

'এই গুণ চিহ্নের মানে কি?'

জোবেদ আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে হাসি মুখে বললেন, একটা গুণ চিহ্ন আঁকতে দু'টা দাগ দিতে হয়। দু'টা দাগ মানে দু'জন মানুষ। দু'টা দাগ দু'দিকে— তার মানে মানুষ দুজন ভিন্ন প্রকৃতির। একটা জায়গায় দাগ দু'টি মিলেছে— তার মানে হল দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ একটা জায়গায় মিলেছে। অর্থাৎ একটি ক্ষেত্রে তারা এক ও অভিন্ন। এরা দু'জন দু'জনকে পছন্দ করে।'

চিত্রা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। জোবেদ আলি বললেন, উপহার পছন্দ হয়েছে?

চিত্রা গাঢ় স্বরে বলল, হ্যাঁ।

জোবেদ আলি বললেন, তুমি বেশ কিছুদিন আগে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলে আমি ভেবেছিলাম কোনদিন সেই চিঠির জবাব দেব না। আজ এই পাথর দিয়ে জবাব দিলাম।

চিত্রা ধরা গলায় বলল, থ্যংক য়্যু। আমি খুব খুশী হয়েছি।

'বেশ তাহলে এখন যাও। আমি এখন "সৌন্দর্য বিষয়ে আমার অজ্ঞতা" প্রসঙ্গে লেখাটা শেষ করব।'

চিত্রা পাথর নিয়ে বের হয়ে এল। সিড়ি দিয়ে নামার সময় পাথরটা সে গালে চেপে রাখল। তার চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে আসছে।

২

'তোর কোলে এটা কি?'

চিত্রা মা'র দিকে না তাকিয়ে সহজ গলায় বলল, পাথর। এর ইংরেজী নাম Stone.

সুরমা বিস্মিত গলায় বললেন, পাথর কোলে নিয়ে বসে আছিস কেন?

চিত্রা এবার মা'র দিকে তাকাল। শান্ত গলায় বলল, বাংলাদেশ সংবিধানে এমন কোন ধারা আছে যে পাথর কোলে নিয়ে বসে থাকা যাবে না?

'সব কথায় তুই এমন প্যাঁচালো জবাব দিস কেন? সরাসরি জবাব দিতে অসুবিধা কি? রশীদ আমাকে বলল, তুই নাকি সারাক্ষণ একটা পাথর নিয়ে ঘুরিস। আমি তার কথা বিশ্বাসই করিনি। এখন দেখছি সত্যি।

পাথর নিয়ে ঘোরা কোন বড় অপরাধের মধ্যে পড়ে না মা। পাথর ছুঁড়ে কারো মাথার ঘিলু বের করে দিলে বাংলাদেশ পেনাল কোডের ৩০২ ধারায় মামলা হবে। পাথরতো আমি ছুঁড়ে মারছি না। কোলে নিয়ে বসে আছি।

'শুধু শুধু পাথর কোলে নিয়ে বসে আছিসই বা কেন?'

'আচ্ছা যাও আমি পাথর রেখে আসছি, অকারণে চেঁচিওনাতো মা।'

চিত্রা পাথর নিয়ে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। সুরমা শংকিত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শংকিত হবার তাঁর যথেষ্ট কারণ আছে। পাথর নিয়ে চিত্রার বাড়াবাড়িটা আজ না অনেক আগেই তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি কিছু বলেন নি। ব্যাপারটা কি বোঝার চেষ্টা করেছেন। সুরমা এই সংসারে বোকার একটা ভাব ধরে থাকেন। সংসার পরিচালনায় এতে তাঁর খুব লাভ হয়। বোকাদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে সবাই অসাবধানে থাকে। তাতে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

চিত্রা যে জোবেদ আলি নামের আধবুড়ো মানুষটার জন্যে পাগল হয়ে আছে তা তিনি বুঝেছেন চিত্রার বোঝার আগেই। কিন্তু যেহেতু সংসারে তিনি বোকা সেজে থাকেন সেহেতু চিত্রাকে কিছু বুঝতে দেন নি। চিত্রা তাঁকে ভুলাবার জন্যে নানান ধরনের অভিনয় করছে। খুব কাঁচা অভিনয়। যখন তাকে বলা হয় যাতো জোবেদ সাহেবকে এক কাপ চা দিয়ে আয় কিংবা এই হালুয়াটা দিয়ে আয় সে বলবে— আমি পারব না মা। আমার উপরে যেতে ইচ্ছা করে না। তিনি যতই জুড়াজুড়ি করবেন সে ততই না করবে শেষে নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠে যাবে। ফিরবে এক থেকে দু'ঘন্টা পর।

এইসব লক্ষণ খুবই খারাপ। অল্প বয়সের ভালবাসা অন্ধ গন্ডারের মত শুধুই একদিকে যায়। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, আদর দিয়ে এই গন্ডার সামলানো যায় না। সুরমা আতংকে অস্থির হয়ে আছেন। আতংকটা প্রকাশ করছেন না। পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছেন। সমস্যাটা ভালমত বুঝতে পারলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যাবে। সমস্যাটা ভালমত বুঝতেও পারছেন না।

জোবেদ আলি সাহেবের ভূমিকাটা এখানে কি ? ভদ্রলোক অতি বুদ্ধিমান। চিত্রার সমস্যাটা তাঁর বুঝতে না পারার কথা না। তিনি কি মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? না সমস্যাটা সামলাবার চেষ্টা করছেন ? একজন দায়িত্বশীল বিচক্ষণ ভদ্রলোক এইসব ব্যাপার কখনো প্রশ্রয় দেবেন না। তাঁর বড় মেয়ের বয়স চিত্রার চেয়ে বেশী। প্রশ্রয় দিতে গেলে এই কথাটা তাঁর অবশ্যই মনে পড়বে। তবে ভদ্রলোকের নিজের মনেও যদি কোন রকম দুর্বলতা জমে থাকে তাহলে তিনিও অন্ধ গন্ডারের মত আচরণ করবেন। পাথরের যে দেবতা সেও পূজা গ্রহণ করে, মানুষ কেন করবে না?

এখন যা করতে হবে তা হল ভদ্রলোককে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এই কাজটা তিনি করতে পারবেন না, চিত্রার বাবাকে দিয়ে করাতে হবে। তবে চিত্রার বাবাকে আসল কথা কিছুই বলা যাবে না। মেয়ের পাগলামী মানুষটার কানে গেলে ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে। সুরমা তাঁর সংসারে ভয়ংকর কিছু চান না।

সুরমা রাতের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে চিত্রার ঘরে গেলেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করবেন। গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে জোবেদ আলি সম্পর্কে কিছু কথা বলে দেখবেন মেয়ের মুখের ভাব বদলায় কিনা। দরকার হলে আজ রাতে মেয়ের ঘরে ঘুমুবেন।

চিত্রা মশারী খাটিয়ে শুয়ে পরার আয়োজন করছিল। চিত্রা মা'কে দেখে বলল, কি হয়েছে মা?

সুরমা হাই তুলতে তুলতে বললেন, আজ তোর সঙ্গে ঘুমুবরে মা।

'আমার সঙ্গে ঘুমুবে কেন?'

'তোর বাবার সঙ্গে ঝগড়ার মত হয়েছে। এই জন্যে।'

'অসম্ভব। মা তুমি আমার সঙ্গে ঘুমুতে পারবে না। তোমার গা থেকে মশলার গন্ধ আসে।'

'কি বলিস তুই, গা থেকে মশলার গন্ধ আসবে কেন?'

'সারাদিন রান্নাবান্না নিয়ে থাক মশলার গন্ধতো আসবেই- এখন আসছে হলুদ আর পেয়াজের গন্ধ। তাছাড়া মা তিনজনের এক বিছানায় জায়গাও হবে না। বিছানা ছোট।'

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, তিনজন কোথায়?

'আমি, তুমি আর পাথর। পাথরটা রাতে আমার সাথে ঘুমায়।'

'পাথর রাতে তোর সঙ্গে ঘুমায়?'

'হ্যাঁ'।

'আমারতো মনে হয় তুই পাগল টাগল হয়ে যাচ্ছিস।'

'পাগল হব কেন ? পাথর সঙ্গে নিয়ে ঘুমালেই মানুষ পাগল হয়ে যায় না। তুমি কি পুতুল সঙ্গে নিয়ে ছোটবেলায় ঘুমুতে না ? পাথরটা হচ্ছে আমার পুতুল।'

পাথরটাকে তুই গোসল দিস? রশীদ আমাকে বলছিল।

'রশীদতো দেখি বিরাট বড় স্পাই হয়েছে। কি করি না করি সব রিপোর্ট করছে।'

'পাথরটাকে তুই গোসল দিস কি-না সেটা বল।'

'হুঁ দেই।'

'কেন?'

'এম্নি দেই মা। এই একটা খেলা। মজার খেলা। আমারতো খেলার কেউ নেই কাজেই পাথর নিয়ে খেলা। তুমিতো আর আমার সঙ্গে খেলবে না।'

সুরমা মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রার মশারি খাটানো শেষ হয়েছে। সে তার পড়ার টেবিল থেকে পাথরটা নিয়ে বালিশে শুইয়ে দিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বলল, এসো ঘুমুতে এসো মা। রাত প্রায় বারোটা বাজে।

'তুই সত্যি সত্যি পাথর নিয়ে ঘুমুবি?'

'হুঁ।'

'পাথরটা তোকে কে দিয়েছে জোবেদ সাহেব?'

'ইয়েস মাদার।'

'তিনি তোকে খুব স্নেহ করেন?'

'স্নেহ করেন না হাতী। স্নেহ করলে কেউ কাউকে পাথর দেয়? দামী গিফট টিফট দিতে পারে।' আড়ং এর সেলোয়ার বা পাথর বসানো নেকলেস।'

'পাথরটা দিলেন কেন?'

'উফ মা চুপ করতো। তোমার বকবকানীর কারণে পাথর বেচারা ঘুমুতে পারছে না। ও ডিসটারবেন্স একেবারে সহ্য করতে পারে না। এই শেষবারের মত আমি তোমাকে আমার ঘরে ঘুমুতে দিলাম আর না।'

চিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার একটা হাত পাথরের উপর রাখা। সুরমা গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন ঘুমের মধ্যেই চিত্রা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের জলে বালিশ ভিজে যাচ্ছে। পাথরটা টেনে বুকের কাছে নিয়ে নিল। একি সর্বনাশ ! সুরমা সারা রাত জেগে রইলেন।

৩

জোবেদ আলি বললেন, তোমার কি খবর ?

চিত্রা হাসিমুখে বলল, আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

'খুব ভাল কথা বিরক্ত কর।'

'জ্ঞানের কিছু কথা জানিয়ে দিনতো।'

'জ্ঞানের কথা জানতে চাও ?'

'হু চাই। জ্ঞানের কথা বলতে বলতে আপনি যখন ক্লান্ত হয়ে যাবেন তখন কিছুক্ষণ ভালবাসার কথা বলতে পারেন।'

'ভালবাসার কথাও শুনতে চাও?'

'হুঁ চাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে খুব অসভ্য মেয়ে ভাবছেন। ভাবলে ভাববেন। আমি কেয়ার করি না।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ তাই। এখন থেকে আমি ঠিক করেছি যখনই আমার জ্ঞানের কথা শুনতে ইচ্ছা করবে তখনি আমি চলে আসব। সেটা সকাল হতে পারে, দুপুর হতে পারে আবার রাত তিনটাও হতে পারে। কাজেই কখনো যদি রাত তিনটায় আপনার

দরজায় টুক টুক শব্দ হয় তাহলে ভূতটুত ভেবে বসবেন না। এখন বলুন আপনার জ্ঞানের কথা।'

'জ্ঞানের কথা শুনবে?'

'হুঁ।'

'ফেরাউনদের সময়কার হিরেলোগ্রাফি দিয়ে একটা গল্প বলব?'

'বলুন।'

'কাগজ কলম দাও গল্প বলি'।

'গল্প বলতে কাগজ কলম লাগে?'

'এই গল্পে লাগে। গল্পটা হচ্ছে আদি ও মৌলিক গল্প। গল্পের মজাটা হল চিত্র লিপিতে, গল্প শোনার সঙ্গে সঙ্গে কি ছবি আঁকা হচ্ছে তা খেয়াল রাখবে-

এক দেশে এক রাজা ছিল

রাজার এক রাণী ছিল।

রাজা ও রাণী সুখে বাস করত

এক সময় রাণী গর্ভবতী হলেন

তখন হঠাৎ রাজা মারা গেলেন

যথাসময়ে রাণীর এক সন্তান হল

এক সময় রাণীও মারা গেলেন

বেঁচে রইল শুধু রাজকুমার।

এবং রাজকুমারের মধ্যে রাজবংশের ভবিষ্যৎ বীজ।

চিত্রকথায় পুরো গল্পটা হবে-

গল্পটা কেমন লাগল?

চিত্রা ক্ষীণ গলায় বলল, অদ্ভুত। জোবেদ আলি বললেন, ছবি এঁকে এঁকে বান্ধবীদের সঙ্গে এই গল্পটা করবে দেখবে ওরা খুব মজা পাবে।

চিত্রা গম্ভীর মুখে বলল, আমার কোন বান্ধবী নেই। বান্ধবী থাকলে অবশ্যই এই গল্পটা বলতাম। আচ্ছা আপনি কি হাত দেখতে পারেন ?

'না।'

'আমার মনে হচ্ছে পারেন। প্লীজ আমার হাত দেখে দিন।'

'এস্ট্রলজির দু'একটা বই টই পড়েছি—কিন্তু হাত দেখার উপর কোন বই পড়ি নি।'

চিত্রা বলল, আমি হাত দেখার উপর কোন বই পড়ি নি—কিন্তু আমি হাত দেখতে জানি। একজনের কাছ থেকে শিখেছি- দেখি আপনার হাতটা দিন-আমি দেখে দেই।

'এই বয়সে তুমি আমার হাতে কিছু পাবে না। মৃত্যু রেখা পেতে পার। মৃত্যু রেখার ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

'আপনার না থাকলেও আমার আছে।'

জোবেদ আলি গম্ভীর গলায় বললেন- হাত দেখা টেখা কিছু না, তুমি আসলে আমার হাত ধরার একটা অজুহাত খুঁজছ।

'আপনার তো বেশী বুদ্ধি এইজন্যে সব আগে ভাগে বুঝে ফেলেন। আপনার হাত ধরতে চাইলে আমি সরাসরিই হাত ধরতাম, ভনিতা করতাম না।'

'হাত ধরতে চাও না ?'

চিত্রা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গাঢ় গলায় বলল, চাই।

জোবেদ আলি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সুরমা ছাদে এসেছিলেন শুকনা কাপড় নিতে। শুকনা কাপড় নেয়াটা তাঁর অজুহাত তিনি আসলে এসেছেন চিত্র কি করছে তা দেখার জন্যে। কাপড় তুলতে তুলতে নিঃশব্দে দেখে চলে যাবেন এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তিনি খোলা জানালায় যে দৃশ্য দেখলেন তা দেখার জন্যে তাঁর কোন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি দেখলেন চিত্রা দু'হাতে জোবেদ আলির হাত চেপে ধরে আছে এবং ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। জোবেদ আলি মূর্তির ভঙ্গিমায় বসে আছেন।

সুরমা সম্বিৎ ফিরে পেয়েই দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। সারা বিকাল তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। সন্ধ্যায় প্রচন্ড মাথা ধরল। রাতে তিনি কিছু খেতে পারলেন না। আজীজ সাহেব রাতের খাওয়া শেষ করে ঘুমুতে এলে সুরমা বললেন-জোবেদ সাহেবতো অনেকদিন থাকলেন এখন চলে যেতে বললে কেমন হয় ?

আজীজ সাহেব চোখ সরু করে তাকালেন। স্ত্রীর সব কথাতেই তিনি চোখ সরু করেন। এবার যেন আরো বেশী সরু করলেন।

'বোকার মত কথা বলবে না। একজন ভদ্রলোককে খামাখা চলে যেতে বলব কেন ? অসুবিধাটা কি ? মাসে মাসে দু' হাজার টাকা পাচ্ছ। এটা সহ্য হচ্ছে না ? তুমি হাঁড়ি পাতিল নিয়ে আছ হাঁড়ি পাতিল নিয়ে থাক।'

সুরমা তারপরেও ক্ষীণ গলায় বললেন, একজন পুরুষ মানুষ ছাদে থাকে- মেয়েরা ছাদে কাপড় শুকুতে যায়।

'তাতে হয়েছে কি ?'

'না কিছু হয় নি।'

'কাকে ভাড়া দেব কাকে দেব না এইসব চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। চিন্তার মানুষ আছে।'

'আচ্ছা।'

'বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে আস।'

সুরমা বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেলেন ঠিকই তাঁর এক ফোটা ঘুম হল না। এক রাতে চারবার চিত্রার শোবার ঘরে গেলেন দেখার জন্যে চিত্রা ঘরে আছে কি-না। তাঁর মনে হল বাকি জীবনে তিনি আর কখনোই রাতে ঘুমুতে পারবেন না।

চিত্রার ঘরের বাতিও জ্বলছে। বাতি জ্বেলে সে কি করছে ? দরজায় টোকা দিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন ? চিত্রা রেগে যাবেনাতো ? সে আজকাল অল্পতেই রেগে আগুন হচ্ছে। অকারণেই রাগছে। তিনি মেয়ের ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। টোকার শব্দ শুনেই চিত্রা বলল, কি চাও মা ?

'ঘুমাচ্ছিস না ?'

'না।'

'না কেন ?'

'ওর ঘুম ভেঙ্গে গেছে কাজেই আমিও জেগে আছি। গল্প করছি।'

'কার সঙ্গে গল্প করছিস ?'

'পাথরটার সঙ্গে।'

'মা দরজাটা একটু খুলতো।'

সুরমা ভেবেছিলেন মেয়ে দরজা খুলবে না। রাগ করবে। সে রকম হল না। চিত্রা দরজা খুলল। তার এক হাতে পাথর। মেয়ে কি সারাক্ষণই পাথর হাতে বসে থাকে। সুরমা ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুই পাথরের সঙ্গে গল্প করছিলি ?

'হুঁ।'

'পাথর কথা বলতে পারে ?'

'পাথর কি কথা বলবে ? পাথর কি মানুষ না-কি ? আমি কথা বলি ও শুনে।'

'তুই ঘুমুতে যাস কখন ?'

'আমি ঘুমুতে যাই না। রাতে আমার ঘুম হয় না মা। আগে ঘুমের অষুধ খেলে ঘুম হত এখন তাও হয় না। আজ পাঁচটা ঘুমের অষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম। ঠিক এক ঘন্টা পর জেগে উঠেছি।'

'তুই একজন ভাল ডাক্তার দেখা।'

'শুধু শুধু ডাক্তার দেখাব কেন ? আমার জ্বর হয়নি। মাথা ব্যথা হচ্ছে না। দিব্যি আরামে আছি। মা তুমি এখন যাও তার সঙ্গে আমার খুব গোপন কিছু কথা আছে। তোমারে সামনে বলা যাবে না।'

'তুই শুয়ে থাক আমি তোর চুলে বিলি দিয়ে দি।'

'তুমি আমাকে অনেক বিরক্ত করেছ। এখন যাও আর না।'

তিনি বের হয়ে এসে জায়নামাজে বসলেন। ফজর ওয়াক্ত পর্যন্ত দোরুদ পাঠ করলেন। দরুদে শেফা।

ফজরের নামাজ শেষ করেই তিনি খতমে ইউনুস শুরু করলেন। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার পড়তে হবে দোয়া ইউনুস। ইউনুস নবী এই দোয়া পড়ে মাছের পেট থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। সুরমা যে বিপদে পড়েছেন—মাছের পেটে বাস করা তার কাছে কিছুই না। কিছু কিছু বিপদ থাকে মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম-চোখে পর্যন্ত দেখা যায় না, কিন্তু মাকড়শার জালের মত হালকা না। এই ধরনের বিপদ আপদ থেকে সচরাচর উদ্ধার পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের অসীম দয়াতেই উদ্ধার সম্ভব। তিনিতো কোন পাপ করেন নি। আল্লাহ পাক কি তাকে দয়া করবেন না ?

আল্লাহ পাক সুরমাকে দয়া করলেন—এক রোববার ভোরে আজীজ সাহেবের বাড়ির উঠান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। উঠানে জোবেদ আলি হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন—তাঁর মাথা থ্যাতলানো। ঘিলু বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। ভয়াবহ দৃশ্য। মানুষটা খুব ভোরবেলা তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে গেছে।

আজীজ সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর লাভের গুড় পিপড়া খেয়ে ফেলল। ঘটনা সামলাবার জন্যে পুলিশকে ষাট হাজার টাকা ঘুস দিতে হয়েছে। পুলিশ ইচ্ছা করলে কৃষ্ণপক্ষের রাতকে চৈত্রমাসের দিন করে ফেলতে পারে। সামান্য আত্মহত্যাকে মার্ডার বলতে তাদের আটকাবে না। সম্পূর্ণ বিনা কারণে তাকে জেল হাজতে পঁচতে হবে।

পুলিশের সমস্যা সামাল দিলেও আজীজ সাহেব ঘরের সমস্যা সামাল দিতে পারলেন না। চিত্রার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল। তার কথা অস্পষ্ট হয়ে গেল। কাকে কি বলে না বলে কিচ্ছু বোঝা যায় না। তার খাওয়ার ঠিক নেই, নাওয়ার ঠিক নেই। সারাদিন তার কোলে থাকে পাথর। সে নিজে গোসল করে না, পাথরটাকে রোজ গোসল দেয়। গুণগুণ করে পাথরকে কি যেন বলে।

আজীজ সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, এর কি হয়েছে ? এ রকম করে কেন ?

সুরমা বললেন, কিচ্ছু না। ঠিক হয়ে যাবে। এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে মাথাতো খানিকটা এলোমেলো হবেই।

'কারো মাথা এলোমেলো হল না, তারটা হল কেন ?'

'বাচ্চা মানুষ। ঠিক হয়ে যাবে।'

'পাথর নিয়ে এইসব কি করছে ?'

'বললামতো ঠিক হয়ে যাবে কয়েকটা দিন যাক।'

'ব্যাপারটা কি ঠিকমত গুছিয়ে বলতো।'

'ব্যাপার কিছু না, জোবেদ ভাই চিত্রাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সারাক্ষণ মা' মা ডাকতেন। চিত্রা দেখতেও তাঁর মেয়ের মত। নিজের মেয়েকে দেখেন না সেই জন্যে -----।

তিনি চিত্রাকে স্নেহ করতেন বলে চিত্রাকে একটা পাথর গালে লাগিয়ে বসে থাকতে হবে ? আমিতো কিচ্ছু বুঝছি না- ঐ হারামজাদার সঙ্গে আমার মেয়ের কি হয়েছে ?

'তুমি মাথা গরম করো না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ডাক্তারের কাছে নিয়ে চিকিৎসাতো করানো দরকার।'

'চিকিৎসা করাব, কয়েকটা দিন যাক।'

চিত্রার অসুখ সারতে দীর্ঘদিন লাগল।

এক সকালে সে তার স্যুটকেসে পাথর ভরে রেখে সহজ গলায় মা'কে বলল, মা নাশতা দাও ক্ষিধে লেগেছে।

সুরমা মনের আনন্দে কেঁদে ফেললেন। তার দু'বছর পর চিত্রার বিয়ে হয়ে গেল এক ডাক্তার ছেলের সঙ্গে। শ্যামলা হলেও ছেলেটি সুপুরুষ। খুব হাসি খুশি, সারাক্ষণ মজা করছে। চিত্রার তার স্বামীকে খুব পছন্দ হল। পছন্দ হবার মতই ছেলে। চিত্রা মণিপুরী পাড়ায় তার স্বামীর পৈত্রিক বাড়িতে বাস করতে গেল। তার জীবন শুভ খাদে বইতে শুরু করল।

তের বছর পরের কথা।

চিত্রা তার মেয়েকে নিয়ে কিছুদিন বাবার বাড়িতে থাকতে এসেছে। চিত্রার স্বামী গিয়েছে ভিয়েনায় ডাক্তারদের কি একটা সম্মেলনে। চিত্রারও যাবার কথা ছিল, টিকিট ভিসা সব হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা ফ্লাইট, ভোরবেলা ছোট একটা দুর্ঘটনা ঘটল। চিত্রার মেয়ে রুনি সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে সামনের একটা দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। এমন কোন বড় দুর্ঘটনা না। কিছু রক্ত পড়েছে, ঠোঁট কাটার জন্যে ফুলে গেছে। এতেই চিত্রা অস্থির হয়ে গেল। সে কিছুতেই মেয়েকে ফেলে যাবে না। সে থেকে যাবে। রুনি যতবারই বলে, তুমি যাওতো মা ঘুরে আস। তুমি না গেলে বাবা মনে খুব কষ্ট পাবে। ততবারই চিত্রা বলে, তুই মাতাব্বরি করবি নাতো। তোর মাতাব্বরি অসহ্য লাগে।

'বাবা এত আগ্রহ করে তোমাকে নিতে চাচ্ছে তাঁর কত রকম প্লান।'

'যথেষ্ট বক বক করেছিস। আর না। তোকে ফেলে রেখে আমি যাব না। এটা আমার ফাইন্যাল কথা।'

মা'র বাড়িতে এসে চিত্রার খুব ভাল লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে পৃথিবীর কিছু কিছু জিনিস বদলায় না। সেই কিছু কিছু জিনিসের একটি হচ্ছে মা'র বাড়ি। মা বদলে গেছেন। একটা চোখে কিছুই দেখেন না। হাত কাঁপা রোগ হয়েছে—পারকিনসনস ডিজিজ। সারাক্ষণই হাত কাঁপে। কিন্তু মনের দিক থেকে আগের মতই আছেন। খানিকটা পরিবর্তন অবশ্যি হয়েছে—আগে বোকার ভাব ধরে থাকতেন এখন থাকেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর বোকা ভাব ধরে থাকার প্রয়োজন সম্ভবত ফুরিয়েছে। ভাড়াটে, স্বামীর ব্যবসা, দোকান সব তিনি নিজে চালান এবং ভালই চালান। আজীজ সাহেব তার বোকা স্ত্রীর কর্মক্ষমতা দেখে যেতে পারেনি। দেখে গেলে বিস্মিত হতেন।

চিত্রা বেশির ভাগ সময় তার মায়ের সঙ্গে গল্প করে কাটায়। তার সব গল্পই স্বামী এবং কন্যাকে কেন্দ্র করে।

'রুনির খুব বুদ্ধি হয়েছে মা। ওর বুদ্ধি দেখে মাঝে মাঝে ভয় লাগে।'

'বুদ্ধিতো ভাল জিনিস। বুদ্ধি দেখলে ভয় লাগবে কেন?'

'অতিরিক্ত বুদ্ধির মানুষ অসুখী হয় এই জন্যেই ভয়। যার মোটামুটি বুদ্ধি সে থাকে সুখে। এই যে আমাকে দেখ আমি সুখে আছি।'

'সুখে আছিস?'

'খুব সুখে আছি।'

'স্বামীর ভালবাসা পুরোপুরি পেয়েছিস?'

'হুঁ। ও আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিচ্ছু করে না। একদিন কি হয়েছে মা

শোন, ওর স্কুল জীবনের এক বন্ধুর ছেলের জন্মদিনে গিয়েছে। আমারো যাবার কথা—ভাইরাস জ্বরে ধরেছে বলে যাইনি। ও একা গিয়েছে। রাত আটটায় তার টেলিফোন। টেলিফোনে বলল, চিত্রা আমার বন্ধু খুব ধরেছে বাসায় খেয়ে আসতে। খেয়ে আসব? আমি বললাম, এ কি রকম কথা? বন্ধু খেতে বলেছে খেয়ে আসবে এর মধ্যে জিজ্ঞেস করা করির কি আছে। অবশ্যিই খেয়ে আসবে। টেলিফোনটা যে করেছে তারো ইতিহাস আছে। বন্ধুর বাসায় টেলিফোন নেই, কার্ডফোন থেকে করেছে।

সুরমা হাসি মুখে বললেন, গৃহপালিত স্বামী।

চিত্রা আনন্দিত গলায় বলল, আমার গৃহপালিত স্বামীই ভাল।

'পোষ মানাতে পারলে সব স্বামীই গৃহপালিত হয়। তুই পোষ মানানোর কায়দা জানিস। আমি জানতাম না।'

'তুমিও জানতে। তুমি সেই কায়দা ব্যবহার করনি। বোকা টাইপের স্ত্রীরা স্বামীকে গৃহপালিত করে ফেলতে চায়— যাদের খুব বেশি বুদ্ধি তারা চায় না। ঠিক বলিনি মা?'

'মনে হয় ঠিকই বলেছিস।'

'ও দশদিনের জন্যে ভিয়েনা গিয়েছে। কিন্তু মা আমি নিশ্চিত ও চারদিনের মাথায় ফিরে আসবে। এই নিয়ে আমি এক লক্ষ টাকা বাজি ধরতে পারি। বাজি ধরবে?'

'পাগল হয়েছিস বাজি ধরলেই আমি হারব।'

মনের আনন্দে চিত্রা হাসতে লাগল। সেই হাসি দেখে সুরমার মন ভরে গেল। তিনিও অনেকদিন পর মন খুলে হাসলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এমন আনন্দময় সময় তাঁর জীবনে আসেনি।

রাতে শোবার সময় রুনি রহস্যময় গলায় বলল, মা দেখ কি পেয়েছি। এই তাকাও একটু।

'কি পেয়েছিস?'

'একটা পাথর। এই দেখ মা— পাথরটার গাটা কি স্মুথ।'

চিত্রা তাকাল। তার শরীর মনে হল জমে গেছে। শরীরের ভেতরটা জমে গেলেও হাত পা কাঁপছে। রুনি বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে মা?

চিত্রা জড়ানো গলায় বলল, পাথর কোথায় পেয়েছিস?

'খাটের নিচে। তুমি এ রকম করছ কেন?'

চিত্রার মাথা যেন কেমন করছে। সে এসে খাটে বসল।

রুনি বলল, পানি খাবে মা? পানি এনে দেব?

'হুঁ।'

রুনি পানির গ্লাস হাতে এসে দেখে তার মা পাথর কোলে নিয়ে বসে আছে। মা'র কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখ রক্তশূন্য। যেন অনেকদিন কঠিন রোগ ভোগ করে উঠেছে।

'মা পানি নাও।'

চিত্রা আগের মতই জড়ানো গলায় বলল, পানিটা খাইয়ে দাও মা। কথা অস্পষ্ট শুনাল আবার তার পুরানো অসুখটা কি ফিরে আসছে?

'পাথরটা কোলে নিয়ে বসে আছ কেন মা?'

'ছোটবেলায় আমি এই পাথর নিয়ে খেলতাম।'

'এতবড় পাথর নিয়ে কি খেলতে?'

'পাথরটাকে গোসল করাতাম। আদর করতাম। ঘুমুবার সময় সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতাম। চুমু খেতাম।'

'কেন?'

'তখন আমার একটা অসুখ হয়েছিল।'

'অসুখটা কি এখনো আছে?'

'না।'

'ঘুমুবে না মা?'

'হ্যাঁ ঘুমাব।'

চিত্রা পাথর সঙ্গে নিয়ে ঘুমুতে গেল। রুনি দেখল কিন্তু কিছুই বলল না। মা'কে তার এখন খুবই অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে মা অপরিচিত একটা মেয়ে যাকে সে চিনতে পারছে না, মাও তাকে চিনছে না। রুনি ভয়ে ভয়ে ডাকল, মা মা।

চিত্রা মেয়ের দিক থেকে মুখ সরিয়ে অন্য পাশে ফিরল। তার হাতে পাথরটা ধরা। রুনি আবার ডাকল, মা মা, একটু এদিকে ফের।

চিত্রা ফিরল না বা জবাবও দিল না। রাত বাড়তে লাগল। পুরো বাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেও চিত্রা ঘুমুতে পারছে না। ঘুম না হবার জন্যে তার কষ্ট হচ্ছে না। ঘর অন্ধকার। পাশেই তার মেয়ে ঘুমুচ্ছে। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে। বারান্দার বাতির খানিকটা আলো এসে পড়েছে বিছানায়। চিত্রা ঘুমুচ্ছে তার পরিচিত খাটে। এই ঘরের প্রতিটি জিনিস তার চেনা— তারপরও সব কেমন অচেনা হয়ে গেছে। মাথা কেমন ঝিম ঝিম করছে। মনে হচ্ছে সে একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়েছে।

'চিত্রা।'

চিত্রা বলল, হুঁ।

'তুমি কেমন আছ?'

'ভাল।'

'পাশে যে ঘুমুচ্ছে সে কি তোমার মেয়ে?'

'হুঁ।'

কেউ একজন তাকে প্রশ্ন করছে। সেই কেউটা কে? পাথরটা কি প্রশ্ন করছে? হ্যাঁ তাইতো পাথরটাতো কথা বলছে। চিত্রা বিস্মিত হল না। পাথরটা তার সঙ্গে কথা বলছে এটা তার কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। সে জবাব দিচ্ছে এটাও স্বাভাবিক। কেন সে জবাব দেবে না?

'চিত্রা!'

'হুঁ।'

'তোমার সুন্দর সংসার হয়েছে এটা দেখেও আমার ভাল লাগছে।'

'হুঁ।'

'আমি জানতাম তোমার সুন্দর সংসার হবে।'

'আপনি মরে গেলেন কেন?'

'মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি?'

'এভাবে মরলেন কেন?'

'যে ভাবেই মরি, মৃত্যু হচ্ছে মৃত্যু।'

'জ্ঞানের কথা ভাল লাগছে না!'

'পৃথিবীর সব কথাই জ্ঞানের কথা।'

'আপনি মরে গেলেন কেন?'

'কেউ একজন ভেবেছিল আমার মৃত্যুতে তোমার সমস্যা সমাধান হবে। হয়েছেও তাই। তোমার এখন আর কোন সমস্যা নেই।'

'আপনাকে কি কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল?'

'হুঁ।'

'আমার তাই মনে হয়েছে। আপনার ডেড বডি উঠোনে পড়েছিল— আমি দেখতে যাই নি।'

'ভাল করেছ। দৃশ্যটা অসুন্দর। অসুন্দর কিছু না দেখাই ভাল।'

'কে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল?'

'যেই ফেলুক। তার উপর আমার কোন রাগ নেই?'

'আমারো নেই। তারপরেও জানতে ইচ্ছে করে কে। আমি যখন অসুস্থ ছিলাম তখন সব সময় মনে হত আমি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছি। আচ্ছা বলুনতো আমি কি ফেলেছি?'

'না—তোমার মা ফেলেছিলেন।'

'ও আচ্ছা।'

'তোমার মা'র উপর আমার কোন রাগ নেই চিত্রা।'

'আমিতো আপনাকে আগেই বলেছি আমারো রাগ নেই।'

'তোমার মেয়েটি খুব সুন্দর হয়েছে ওর নাম কি?'

'ওর নাম রেনু — ভাল নাম রেহনুমা।'

'সুন্দর নাম।'

'ওর খুব বুদ্ধি।'

'শুনে ভাল লাগছে চিত্রা।'

'কতদিন পর কথা বলছেন আমার অসম্ভব ভাল লাগছে।'

'তোমার ভাল লাগছে শুনে আমারো ভাল লাগছে। আমি সারারাত কথা বলব— তোমাকে কিন্তু তারপর ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে।'

'আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আপনি যদি আমাদের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে বলেন আমি লাফিয়ে পড়ব। আপনি বলে দেখুন।'

'তোমাকে এইসব কিচ্ছু করতে হবে না।'

'কি করতে হবে বলুন।'

'ভোরবেলা তুমি ছাদে উঠবে, পারবে না?'

'পারব।'

'হাতে থাকবে পাথরটা।'

'আচ্ছা।'

'তারপর পাথরটা ছুড়ে ফেলবে ঠিক আমি যে জায়গায় পড়েছিলাম সেই জায়গায়।'

'কেন?'

'আমি পাথরের ভেতর বন্দি হয়ে আছি। পাথরটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেলেই আমি মুক্তি পাব।'

'আমার এখন জ্ঞানের কথা শুনতে ইচ্ছে করছে, আপনি জ্ঞানের কথা বলুন।'

" I often see flowers from a passing car
That are gone before I can tell what they are."

'এর মানে কি?'

'রবার্ট ফ্রস্টের একটা বিখ্যাত কবিতার প্রথম দু'টি লাইন।'

'জ্ঞানের কথা শুনতে ভাল লাগছে না, অন্য কিছু বলুন ..... ভালবাসার কথা বলুন! আচ্ছা ভালবাসা কি?'

রাত শেষ হয়ে আসছে। আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। চিত্রা পাথর হাতে খুব সাবধানে খাট থেকে নামল।

সুরমা ফজরের নামাজে বসেছিলেন। বিকট শব্দে তিনি নামাজ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। ভারী কিছু যেন ছাদ থেকে পড়ল।

কে পড়ল ? তাঁর বুধ ধ্বক ধ্বক করছে। সেই ধ্বক ধ্বকানি তীব্র হবার আগেই চিত্রা ঢুকল। সুরমা স্বাভাবিক হলেন। সহজ গলায় বললেন, কিসের শব্দ?

চিত্রা খুব সহজ গলায় বলল— আমার যে একটা পাথর ছিল সেই পাথরটা টুকরা টুকরা করে ভাঙ্গলাম। ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলেছি— একেবারে শত খণ্ড হয়েছে।

সুরমা তাকিয়ে রইলেন।

চিত্রা বলল, চা খাবে মা? চা বানিয়ে নিয়ে আসি তারপর এসো দু'জনে মিলে চুকচুক করে চা খাই। ও আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি —তুমি জোবেদ চাচাকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলে তাই না মা?

সুরমা তাকিয়েই রইলেন কোন জবাব দিলেন না। চিত্রা হালকা গলায় বলল, ভালই করেছ মা। তোমার চায়ে চিনি দেব? তুমি চায়ে চিনি খাওতো?

অতিথি

তিন বছর পর সফুরা দেশে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে সে যে একনাগাড়ে এতদিন পার করে দিয়েছে তা সে নিজেও বুঝতে পারে নি। এই তো মনে হয় সেদিন মাত্র এসেছে। এক শীতে এসেছিল, মাঝখানে দুটা শীত গিয়ে এখন আবার শীতকাল।

প্রথম দিন ভীতমুখে বারান্দায় বসে ছিল। বেগম সাহেব তাকে দেখেও না-দেখার ভান করলেন। দুটা সুন্দর-সুন্দর বাচ্চা— রূপা, লোপা; পাশেই খেলছে, অথচ তার দিকে তাকাচ্ছে না। এক সময় সফুরা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কী নাম তোমার ভইন?

রূপা তার দিকে না তাকিয়েই বলল, আমাকে 'ভইন' ডাকবে না।

সফুরা চুপ করে গেল। সময় কাটতেই চায় না। এরা তাকে কাজে বহাল করবে কি-না তাও বোঝা যাচ্ছে না। তার খুব পানি পিপাসা হচ্ছে— কার কাছে পানি চাইবে?

এক সময় বেগম সাহেব চায়ের কাপ হাতে তার সামনে বসলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী নাম?

'সফুরা।'

'ঘরের কাজকর্ম জানো ?'

সফুরা কী বলবে বুঝতে পারল না। ঘরের কাজকর্ম সে তো অবশ্যই জানে। ভাত রাঁধা, বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া .... কিন্তু ঢাকার এইসব বাড়িতে কাজকর্ম কী রকম কে বলবে।

'আগে কখনো বাসায় কাজ করেছ?'

'জে-না।'

'ঢাকায় কী এই প্রথম?'

'জে।'

বেগম সাহেব কঠিন মুখে বললেন, হাত ধরে-ধরে কাজকর্ম শেখাব, তারপর পাখা গজাবে। উড়ে চলে যাবে অন্য বাসায়। তোমাদের আমার চেনা আছে।

'আমি কোনোখানে যামু না।'

'খামোকা এইসব বলবে না। আগে অনেকবার শুনেছি। বেতন চাও কত?'

সফুরা চুপ করে রইল। যে তাকে নিয়ে এসেছে সে বারবার বলে দিয়েছে—বেতনের কথা বললে চুপ কইরা থাকবা। আগ বাড়াইয়া কিছু বলবা না। চুপ করে আছে। কিছু বলছে না।

'কী, কথা বল না কেন? কত চাও বেতন?'

'আপনের যা ইচ্ছা।'

'কাপড়চোপড় নিয়ে এসেছ?'

সফুরা লজ্জা পেয়ে গেল। কাপড়চোপড় আনবে কী? একটা শাড়ি ছিল সেটাই নিয়ে এসেছে। যার কাপড়চোপড় আছে সে কি আর ছেলেপুলে স্বামী ছেড়ে ঢাকায় কাজ করতে আসে?

বেগম সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তোমাদের এই আরেক টেকনিক। এক কাপড়ে উপস্থিত হবে। যাতে সঙ্গে-সঙ্গে একটা শাড়ি কিনে দিতে হয়।

সফুরা মাথা নিচু করে রাখল।

'তোমার কী নাম যেন বললে?'

'সফুরা।'

'শোন সফুরা, থাক এইখানে। কাজ কর। কয়েকদিন কাজ দেখি। যদি কাজ পছন্দ হয় বেতন ঠিক করব। আমার সংসার ছোট। কাজকর্ম নেই বললেই হয়। মেয়েদের কখনো নাম ধরে ডাকবে না। আন্টি ডাকবে। একজন বড় আন্টি, একজন ছোট আন্টি। মনে থাকবে?'

'জে।'

'আমাদের আলাদা বাথরুম। ঐ বাথরুমে কখনো ঢুকবে না। মনে থাকবে?'

'জে।'

'তোমাকে আলাদা থালা, গ্লাস দেয়া হবে। সব সময় সেগুলি ব্যবহার করবে। আমাদের থালা গ্লাস কখনো ব্যবহার করবে না।'

'জে আইচ্ছা।'

'সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। গ্রাম থেকে এসেছ, পেট ভর্তি কৃমি। কৃমির ওষুধ খাইয়ে দেব। মাথায় উকুন আছে?'

'জে।'

'উকুনের ওষুধ দেব। লরেকসিন চুলে মেখে গোসল কর।'

'জে আইচ্ছা।'

'দুদিন পরপর দেশের বাড়িতে যাওয়া। এর অসুখ তার অসুখ এইসব চলবে না। দেশে যাবে বৎসরে একবার। দেশের বাড়ি থেকেও প্রতি সপ্তাহে তোমাকে দেখতে লোক আসবে তাও চলবে না। বেতনের টাকা মাসের দু তারিখে দিয়ে দেব। মনি অর্ডার করে কিংবা কারো হাতে পাঠিয়ে দেবে।'

'জে আইচ্ছা।'

'কাচের থালা-বাসন ধরবে খুব সাবধানে। টেবিলের উপর কাচের যে বাটিটা দেখছ, যেখানে ফল রাখা—ঐ বাটিটার দাম তিন হাজার টাকা।'

একটা বাটির দাম তিন হাজার টাকা? সফুরার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। তিন হাজার টাকায় একটা গরু কেনা যায়! সামান্য একটা বাটি, তার দাম তিন হাজার? বাটিটা একবার ছুঁয়ে দেখতে হবে।

সফুরা কাজে বহাল হল। যা-কিছু শেখার ছিল, সাতদিনে শিখে গেল। বেগম সাহেব যে তার কাজে খুশি তাও সে ন'দিনের দিন জেনে গেল। মেঝে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে-মুছতে সে শুনল বেগম সাহেব টেলিফোনে কাকে যেন বলছেন, আমার কাজের মেয়েটা চটপটে আছে। কাজ ভালোই করে। শেখার আগ্রহ আছে। তবে টিকবে না। কাজ শেখা হলে— অন্য বাড়িতে কাজ খুঁজবে। এদের চেনা আছে।

বেগম সাহেবের কথা সত্যি হয় নি। সে কোথাও যায় নি। এ বাড়িতে আছে। গত তিন বছরে দেশেও যায় নি। কয়েকবারই যাওয়া ঠিকঠাক হল। তার এমনি কপাল—যখন দেশে যাওয়া ঠিকঠাক হয় তখনি এ বাড়িতে একটা কিছু ঝামেলা লেগে যায়। প্রথমবার ছোট আন্টির ফ্লু হল। অসুস্থ মানুষকে রেখে যাওয়া যায় না। পরের বার জাপান থেকে কারা যেন বেড়াতে এল। এ বাড়িতে থাকল এক সপ্তাহ। বাড়িতে মেহমান ফেলে সে যায় কীভাবে? তবে ঐ মেহমানরা যাবার সময় তাকে একটা ঘড়ি দিলেন। কী আশ্চর্য কাণ্ড, তার মতো মানুষকে কেউ ঘড়ি দেয়? ঘড়ি দিয়ে সে কী করবে? ঘড়ির সে কী বুঝে? বকুলের বাবা যখন পরের বার টাকা নিতে এল তখন টাকার সঙ্গে ঘড়িও দিল। মানুষটা অবাক।

'ঘড়ি পাইলা কই?'

'আমারে খুশি হইয়া দিছে।'

'কও কী তুমি!'

'যা সত্য তাই কইলাম।'

'বেজায় দামি জিনিস বইল্যা মনে হয়।'

'হুঁ। বেইচ্যেন না।'

'আরে না, বেচব কী! ঘড়ির একটা প্রয়োজন আছে না? ঘড়ির ইজ্জতই আলাদা।'

বকুলের বাবা ঘড়ি হাতে পরে আনন্দে হেসে ফেলল। লোকটা বেজায় শৌখিন। টাকা নিতে যখন আসে মনে হয় ভদ্রলোক। মাথার চুল বেশির ভাগই পেকে গিয়েছিল। একবার এল— সব চুল কুচকুচে কালো। চুলে কলপ দিয়েছে। পাঁচ দশ টাকা নিশ্চয়ই চলে গেছে। লোকটা এইসব দেখবে না। বড় শৌখিন। সফুরা বড় ইচ্ছা করে এই শৌখিন মানুষটাকে চেয়ার-টেবিলে বসিয়ে চারটা ভাত খাওয়ায়। তিন হাজার টাকা দামের বাটিতে করে সালুন এনে দেয় তা তো সম্ভব না। বেগম সাহেব বলে দিয়েছেন, তোমার স্বামী যে দুদিন পরপর ফুলবাবু সেজে চলে আসে খুব ভালো কথা। আসুক। তাকে ঘরে ঢুকাবে না। বাইরে থেকে বিদায় দেবে। একবার ঘরে ঢুকলে অভ্যাস হয়ে যাবে।

বেগম সাহেবের কথাগুলি শুনতে খারাপ লাগলেও কিছু করার নেই। তাঁর অন্তর ভালো। তিন ঈদেই তার ছেলেমেয়ের জন্য টাকা দিয়েছে। গত ঈদে বেতনের বাইরেও পাঁচশ টাকা দিলেন। একটা গায়ের চাদর দিলেন। তার বেতন ছিল দেড়শ। তাকে কিছু বলতে হয় নি, বেগম সাহেব নিজেই বেতন বাড়িয়ে করেছেন দু'শ। তা ছাড়া লোকজন এ বাড়িতে বেড়াতে এলে যাবার সময় হাতে পঞ্চাশ, একশ টাকা সব সময়ই দেয়। প্রতিটি পাই পয়সা সফুরার কাজে লাগে। বেতনের বাইরের টাকাটা সে জমা করে রাখে। দেশে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে। ছেলেমেয়েদের জন্যে এটা-সেটা নিজের হাতে কিনে নিয়ে যাবে। তার এত কষ্টের টাকা।

বকুলের বাবা এসেছে সফুরাকে নিয়ে যেতে। বাবু সেজে এসেছে। হাতে ঘড়ি। চোখে কালো চশমা। গম্ভীর মুখে বারান্দায় বসে আছে। সফুরা বেগম সাহেবের কাছে বিদায় নিল। কদমবুসি করল এবং কেঁদে ফেলল। তিন বৎসর ছিল। মায়া পড়ে গেছে। যেতেও কষ্ট হচ্ছে। বেগম সাহেব বললেন, তোমার কাজে-কর্মে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার বাচ্চারাও তোমাকে পছন্দ করে। বেশিদিন থেকো না, চলে এসো। আজ থেকে তোমার বেতন আমি তিনশ করে দিলাম। ফিরে এসে এই বেতনেই কাজ করবে।

'আপনের অনেক দয়া আম্মা।'

বেগম সাহেব বেতন ছাড়াও—যাওয়া-আসার গাড়িভাড়া বাবদ দু'শ টাকা দিলেন। একটা প্রায়-নতুন শাড়ি দিলেন। একজোড়া পুরানো স্যান্ডেল দিলেন। উদাস গলায় বললেন, তোমার সাহেবের একটা কোট আছে। এখন আর পরে না। নিয়ে যাও— কাউকে দিয়ে দিয়ো।

বকুলের বাবা সেই কোট সঙ্গে-সঙ্গে গায়ে দিয়ে বলল, ভালো ফিট করছে বউ। মাপ মতো হইছে। চল এখন গাবতলি বাসস্টেশন গিয়া বাস ধরি।

সফুরা বিস্মিত হয়ে বলল, পুলাপানের জন্যে সদাই করমু না? এতদিন পরে দেশে যাইতেছি।

'কী সদাই করবা?'

'চল গিয়া দেখি—জামা জুতা। রিকশা লও।'

বকুলের বাবা সিগারেট ধরিয়ে বাবু সাহেবের মতো টানতে-টানতে খালি রিকশা দেখতে লাগল। সফুরা বলল, আপনেরে চিননের আর উপায় নাই। বাবু সায়েবের মতো লাগতাছে। চউক্ষে চশমা দিছেন— কত দাম চশমার?

'শস্তায় কিনছি। রইদের মইধ্যে চউক্ষে দিলে খুব আরাম হয়।'

'আপনে অখন একজোড়া জুতা কিনেন।'

বকুলের বাবা উদাস গলায় বলল, চল যাই। শস্তায় পাইলে একজোড়া কিনব।

রিকশায় উঠে বকুলের বাবা ক্ষীণ স্বরে বলল, একটা বিষয় হইছে, বুঝলা সফুরা। তোমারে আগে না বললে বাড়িতে গিয়া হই চই করবা। হই চই করনের কিছু না।

সফুরা আতঙ্কিত গলায় বলল, কী বিষয়?

বকুলের বাবা নিচু গলায় বলল, তুমি ঢাকায় চইল্যা আসলা, বাড়ি হইল খালি। ঘরের শতেক কাজকর্ম। সংসার ভাইস্যা যাওনের উপক্রম। গেরামের দশজনে তখন বলল ....

'আপনে কী বিবাহ করছেন?'

'উপায়ান্তর না দেইখ্যা গত বাইস্যা মাসে ...'

'আমারে তো কিছু খবর দেন নাই।'

বকুলের বাবা চুপ করে গেল। সফুরার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল। লোকটা 'বাইস্যা' মাসে বিয়ে করেছে। ঈদের পরপর। বেগম সাহেব জাকাতের টাকা থেকে যে পাঁচশ টাকা বাড়তি দিয়েছেন সেই টাকাটা খরচ করেছে বিয়েতে। জাকাতের টাকাটাই তার কাল হয়েছে।

'রাগ করলা নাকি সফুরা? ভালো মতো বিবেচনা কর। মেয়েমানুষ ছাড়া সংসার চলে? তুমি পইর‍্যা আছ ঢাকা শহরে।'

'নয়া বউ-এর নাম কী?'
'সুলতানা।'
'দেখতে কেমুন?'
'আছে মোটামুটি।'
'গায়ের রং কেমন?'
'ধলা।'

আবার সফুরার চোখে পানি এসে গেল। চিৎকার করে তার কাঁদতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা করলেও তা সম্ভব না। তা ছাড়া কী হবে চিৎকার করে কাঁদলে? কিছুই হবে না।

ঘুরে-ঘুরে অনেক কিছু কিনল সফুরা। ছেলেমেয়েদের জন্যে জামা-জুতা, স্নো-আলতা। একটা মশারি। চিনি, পোলাউয়ের চাল, এক ডজন কমলা। সবার জন্যেই কিছু-না-কিছু কেনা হয়েছে, শুধু নতুন বউয়ের জন্যে কেনা হয় নি। বেচারি মন খারাপ করবে। তার তো কোনো দোষ নাই। তাকে বিয়ে করেছে বলেই সে এই সংসারে এসেছে।

সফুরা নয়া বউ-এর জন্যে একটা লালপেড়ে শাড়ি এবং কাচের চুড়ি কিনল।

বকুলের বাবা বলল, লাল ফিতা কিনো তো বউ। ফিতার কথা বলছিল।

সফুরা লাল ফিতাও কিনল।

দুপুরের দিকে তারা গাবতলি বাসস্টেশন থেকে বাসে উঠল। বকুলের বাবা মিষ্টি পান কিনেছে। সে বসেছে জানালার পাশে। জানালার পাশে ছাড়া সে বসতে পারে না। তার মাথা ধরে যায়। বাস ছাড়ার মুহূর্তে সে ঘড়িতে সময় দেখে গম্ভীর গলায় বলল, রাইত আটটা বাজব। শীতের দিন বইল্যা রক্ষা। আরামে যাইবা। গরমের সময় হইলে খুব কষ্ট হইত। এইটা খিয়াল রাখবা বউ, শীতকাল ছাড়া দেশে আসবা না। বেড়াইবার সময় হইল তোমার শীতকাল।

সফুরা জবাব দিল না। শীতকালের পড়ন্ত রোদে সে বেড়াতে যাচ্ছে। পাশে স্বামী। কতদিন পর দেখবে ছেলেমেয়েদের। আনন্দে তারা চিৎকার করে কাঁদবে। সারারাত হয়তো ঘুমাবে না। নয়া বউ লালপেড়ে শাড়ি পরে তাকে এসে কদমবুসি করবে। সে নয়া বউকে বলবে— আমার অনেক কষ্টের এই সংসার। তুমি এরে দেখেশুনে রাখ। বলতে বলতে সে হয়তো কেঁদে ফেলবে। আজকাল অকারণেই তার চোখে জল আসে। কত আনন্দ করে সে বাড়ি যাচ্ছে। এখন কাঁদার কোনো কারণ নেই। অথচ কী কাণ্ড! সে কেঁদেই যাচ্ছে। অনেককাল আগে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ও সে এইভাবেই কাঁদছিল।

রূপা

'ভাই, আপনি কি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে চান?'

আমি ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। কিছুক্ষণ আগে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে— তাও এমন কোনো আলাপ না। আমি ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি কিনা জানতে চাইলেন। আমি বললাম 'হ্যাঁ' এবং ভদ্রতা করে জানতে চাইলাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি আমার স্ত্রীকে রিসিভ করতে এসেছি। ও চিটাগাং থেকে আসছে। ট্রেন দুঘণ্টা লেট। ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। বাসায় যাব আবার আসব, ভাবলাম অপেক্ষা করি।

তাঁর সঙ্গে এইটুকু আমার আলাপ। এই আলাপের সূত্র ধরে কেউ যখন বলে, ভাই আপনি কি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে চান, তখন খানিকটা হলেও বিস্মিত হতে হয়। অপরিচিত লোকের কাছ থেকে গল্প শোনার আগ্রহ আমার কম। তা ছাড়া আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করছি— ইন্টারেস্টিং গল্প বলে যে-গল্প শুরু হয় সে-গল্প কখনোই ইন্টারেস্টিং হয় না।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক বুদ্ধিমান হলে আমার চুপ করে থাকার অর্থ বুঝতে পারবেন। বুদ্ধিমান না হলে এই গল্প আমায় শুনতেই হবে।

দেখা গেল ভদ্রলোক মোটেই বুদ্ধিমান নন। পকেট থেকে পানের কৌটা বের করে পান সাজাতে-সাজাতে গল্প শুরু করলেন—

'আপনি নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হয়ে আমার কথা শুনছেন। নিতান্তই অপরিচিত একজন মানুষ হড়বড় করে গল্প বলা শুরু করেছে। বিরক্ত হবারই কথা। কিন্তু

সমস্যাটা কী জানেন? আজ আমার জন্যে একটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনে আমার মজার গল্পটা কাউকে-না-কাউকে বলতে ইচ্ছে করে। যদি অনুমতি দেন - গল্পটা বলি।'

'বলুন।'

'আপনি কি পান খান?'

'জি-না।'

'একটা খেয়ে দেখুন মিষ্টি পান। খারাপ লাগবে না।'

'আপনি কি বিশেষ দিনে গল্পের সঙ্গে-সঙ্গে সবাইকে পানও খাওয়ান?'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। আন্তরিক ভঙ্গিতেই হাসলেন। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের মতো হবে। অত্যন্ত সুপুরুষ। ধবধবে শাদা পায়জামা-পাঞ্জাবিতে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছে। মনে হচ্ছে তিনি স্ত্রীর জন্যে খুব সেজেগুজেই এসেছেন।

'প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছি—পদার্থবিদ্যায়। এখানে অন্ধকার বলে আপনি সম্ভবত আমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন না। আলো থাকলে বুঝতেন আমি বেশ সুপুরুষ। কুড়ি বছর আগে দেখতে রাজপুত্রের মতো ছিলাম। ছাত্রমহলে আমার নাম ছিল-'দ্যা প্রিন্স।' মজার ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েমহলে আমার কোনো পাত্তা ছিল না। আপনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না-পুরুষদের রূপের প্রতি মেয়েরা কখনো আকৃষ্ট হয় না। পুরুষদের সবকিছুই তাদের চোখে পড়ে—রূপ চোখে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কোনো মেয়ে আমার সঙ্গে ভাব করার জন্য কিংবা কথা বলার জন্যে এগিয়ে আসে নি। আমিও নিজ থেকে এগিয়ে যাই নি। কারণ আমার তোতলামি আছে। কথা আটকে যায়।'

আমি ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমি তো কোনো তোতলামি দেখছি না। আপনি চমৎকার কথা বলে যাচ্ছেন।

'বিয়ের পর আমার তোতলামি সেরে যায়। বিয়ের আগে প্রচণ্ড রকম ছিল। অনেক চিকিৎসাও করেছি। মার্বেল মুখে নিয়ে কথা বলা থেকে শুরু করে হোমিওপ্যাথি ওষুধ, পীর সাহেবের তাবিজ কিছুই বাদ দেই নি। যাই হোক— গল্পে ফিরে যাই, আমার সাবসিডিয়ারি ছিল ম্যাথ এবং কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রি সাবসিডিয়ারিতে একটি মেয়েকে দেখে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হল। কী মিষ্টি চেহারা! দীর্ঘ পল্লব, ছায়াময় চোখ। সেই চোখ সব সময় হাসছে। ভাই, আপনি কি কখনো প্রেমে পড়েছেন?'

'জি-না।'

'প্রেমে না পড়লে আমার সেই সময়কার মানসিকতা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি প্রথম দিন মেয়েটিকে দেখেই পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সারারাত ঘুম হল না। প্রচণ্ড পানির পিপাসায় একটু পরপর গলা শুকিয়ে যায়। পানি খাই আর মহসিন হলের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করি।

সপ্তাহে আমাদের দু'টা মাত্র সাবসিডিয়ারি ক্লাস। রাগে-দুঃখে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে। প্রতিদিন একটা করে সাবসিডিয়ারি ক্লাস থাকলে কী ক্ষতি হত? সপ্তাহের দু'টা ক্লাস মানে পঞ্চাশ মিনিট করে একশ মিনিট। এই একশ মিনিট চোখের পলকে শেষ হয়ে যায়। তা ছাড়া মেয়েটা খুব ক্লাস ফাঁকি দেয়। এমনও হয়েছে সে পর পর দু-সপ্তাহ কোনো ক্লাস করল না। তখন আমার ইচ্ছা করত লাফ দিয়ে মহসিন হলের ছাদ থেকে নিচে পড়ে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটাই। সে যে কী ভয়াবহ কষ্ট আপনি বুঝবেন না। কারণ আপনি কখনো প্রেমে পড়েন নি।'

'মেয়েটার নাম তো বললেন না, তার নাম কী?'

'তার নাম রূপা। সেই সময় আমি অবিশ্যি তার নাম জানতাম না। নাম কেন— কিছুই জানতাম না। কোন্ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী তাও জানতাম না। শুধু জানতাম তার সাবসিডিয়ারিতে ম্যাথ আছে এবং সে কালো রঙের একটা মরিস মাইনর গাড়িতে করে আসে। গাড়ির নাম্বার— ভ ৮৭৮১।'

'আপনি তার সম্পর্কে কোনোরকম খোঁজ নেন নি?'

'না। খোঁজ নেই নি। কারণ আমার সব সময় ভয় হত খোঁজ নিতে গেলেই জানব— মেয়েটির হয়তোবা কারো সঙ্গে ভাব আছে। একদিনের একটা ঘটনা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন— সাবসিডিয়ারি ক্লাসের শেষে আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মেয়েটা হেসে- হেসে একটা ছেলের সঙ্গে গল্প করছে। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। মনে হল আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। সব ক্লাস বাদ দিয়ে হলে এলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে আমার জ্বর এসে গেল।

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্য তো বটেই। পুরো দু-বছর আমার এইভাবেই কাটল। পড়াশোনা মাথায় উঠল। তারপর একদিন অসীম সাহসের কাজ করে ফেললাম। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভারের কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা জেনে নিলাম। তারপর মেয়েটিকে সম্বোধনহীন একটা চিঠি লিখলাম। কী লিখেছিলাম এখন আর মনে নেই। তবে চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে — আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। তাকে রাজি

হতেই হবে। রাজি না-হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বাড়ির সামনে না-খেয়ে পড়ে থাকব। যাকে পত্রিকার ভাষায় বলে 'আমরণ অনশন'। গল্পটা কী আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ হচ্ছে। তারপর কী হল বলুন। চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দিলেন?'

'না। নিজেই হাতে করে নিয়ে গেলাম। ওদের বাড়ির দারোয়ানের হাতে দিয়ে বললাম, এ বাড়ির একজন আপা আছেন না— ইউনিভার্সিটিতে পড়েন— তাঁর হাতে দিয়ে এস। দারোয়ান লক্ষ্মী ছেলের মতো চিঠি নিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, আপা বলেছেন তিনি আপনেরে চিনেন না। আমি বললাম, তিনি ঠিকই বলেছেন, তবে আমি তাঁকে চিনি। এটাই যথেষ্ট।

এই বলে আমি গেটের বাইরে খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বুঝতেই পারছেন— নিতান্তই পাগলের কাণ্ড। সেই সময় মাথা আসলেই বেঠিক ছিল। লজিক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কোনোরকম ঘটনা ছাড়াই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। লক্ষ্য করলাম দোতলার জানালা থেকে মাঝে-মধ্যে কিছু কৌতূহলী চোখ আমাকে দেখছে। বিকেল চারটায় এক ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বের হয়ে কঠিন গলায় বললেন, যথেষ্ট পাগলামি করা হয়েছে। এখন বাড়ি যাও।'

আমি তার চেয়েও কঠিন গলায় বললাম, যাব না।

'পুলিশে খবর দিচ্ছি। পুলিশ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'কোনো অসুবিধা নেই খবর দিন।'

'ইউ রাস্কেল মাতলামি করার জায়গা পাও না?'

'গালাগালি করছেন কেন? আমি তো আপনাকে গালি দিচ্ছি না।'

ভদ্রলোক রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। তার পরপরই শুরু হল বৃষ্টি। ঢালাও বর্ষণ। আমি ভিজছি নির্বিকার ভঙ্গিতে। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝছি যে জ্বর এসে যাচ্ছে। সারাদিন রোদে পোড়ার পর এই ঠাণ্ডা বৃষ্টি সহ্য হবে না। তখন একটা বেপরোয়া ভাব চলে এসেছে— যা হবার হবে। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। মাঝে-মাঝেই মনে হচ্ছে এই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

ইতোমধ্যে আমি আশেপাশের মানুষদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছি। বেশ কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? আমি তাঁদের সবাইকে বলেছি, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি একজন পাগল মানুষ।

মেয়েটির বাড়ি থেকেও হয়তো টেলিফোনে এই ঘটনার কথা কাউকে-কাউকে জানানো হয়েছে। তিনটি গাড়ি তাদের বাড়িতে এল। গাড়ির আরোহীরা রাগী ভঙ্গিতে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন।

রাত ন'টা বাজল। বৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও থামল না। জ্বরে তখন আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। দারোয়ান এসে আমাকে ফিসফিস করে বলল, সাহেব পুলিশ আনতে চাইতেছেন, বড় আফা রাজি না। বড় আফা আপনের অবস্থা দেইখ্যা খুব কানতাছেন। টাইট হইয়া বইয়া থাকেন।

আমি টাইট হয়ে বসে রইলাম।

রাত এগারোটা বাজল। ওদের বাড়ির বারান্দায় বাতি জ্বলে উঠল। বসার ঘরের দরজা খুলে মেয়েটি বের হয়ে এল। মেয়েটির পেছনে-পেছনে ওদের বাড়ির সব ক'জন মানুষ। ওরা কেউ বারান্দা থেকে নামল না। মেয়েটি একা এগিয়ে এল। আমার সামনে এসে দাঁড়াল এবং অসম্ভব কোমল গলায় বলল, কেন এমন পাগলামি করছেন?

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কারণ এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়। অন্য একটি মেয়ে। একে আমি কোনোদিন দেখি নি। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভার আমাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে। হয়তো ইচ্ছা করেই দিয়েছে।

মেয়েটি নরম গলায় বলল, আসুন, ভেতর আসুন। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। আসুন তো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বলতে চেষ্টা করলাম, কিছু মনে করবেন না। আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনি সেই মেয়ে নন। আপনি অন্য একজন । মেয়েটির মমতায় ডুবানো চোখের দিকে তাকিয়ে এই কথা বলা সম্ভব হল না। এত মমতা নিয়ে কোনো নারী আমার দিকে তাকায় নি।

জ্বরের ঘোরে আমি ঠিকমতো পা ফেলতে পারছিলাম না। মেয়েটি বলল, আপনার বোধহয় শরীর খারাপ। আপনি আমার হাত ধরে হাঁটুন। কোনো অসুবিধা নেই।

বাসার সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কঠিন চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সবার কঠিন দৃষ্টি উপেক্ষা করে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিল। যে গভীর ভালোবাসায় হাত বাড়াল সে ভালোবাসাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেন নি। আমি তার হাত ধরলাম। এই কুড়ি বছর ধরেই ধরে আছি। মাঝে-মাঝে একধরনের অস্থিরতা বোধ করি। ভ্রান্তির এই গল্প আমার স্ত্রীকে বলতে ইচ্ছা

করে। বলতে পারি না। তখন আপনার মতো অপরিচিত একজন কাউকে খুঁজে বের করি। গল্পটা বলি। কারণ আমি জানি— এই গল্প কোনোদিন আমার স্ত্রীর কানে পৌঁছাবে না। আচ্ছা ভাই, উঠি। আমার ট্রেন এসে গেল।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। দূরে ট্রেনের আলো দেখা যাচ্ছে। রেললাইনে ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে। ট্রেন সত্যি-সত্যি এসে গেল।

কল্যানীয়াসু

ট্রেটয়াকভ আর্ট গ্যালারিতে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। পুরনো দিনের মহান সব শিল্পীদের আঁকা ছবি। দেখতে-দেখতে এগুচ্ছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। সঙ্গের রাশিয়ান গাইড বলল, কী হয়েছে?

আমি হাত উঁচিয়ে একটি পেইনটিং দেখালাম। প্রিন্সেস তারাকনোভার পেইনটিং। অপূর্ব ছবি!

জরী, ছবিটি দেখে তোমার কথা মনে পড়ল। গাইড বলল, সেন্ট পিটার্সবার্গ জেলে প্রিন্সেসের শেষ দিনগুলি কেটেছে। ঐ দেখ সেল-এর অন্ধকূপে কী করে বন্যার পানি ঢুকছে। দেখ, প্রিন্সেসের চোখে-মুখে কী গভীর বিষাদ। প্রগাঢ় বেদনা!

আমি কথা বললাম না। অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। গাইড বলল, এস পাশের কামরায় যাই।

আমি নড়লাম না। মৃদু গলায় বললাম, মি. যোখভ আজ আর কিছু দেখব না। চল, কোথাও বসে চা খাওয়া যাক।

দুজনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। ভীষণ শীত বাইরে। রাস্তাঘাট ফাঁকা-ফাঁকা। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া মোটা ওভারকোট ভেদ করে শরীরে বিঁধছে। আমার সঙ্গী হঠাৎ জানতে চাইল, তোমার কি শরীর খারাপ করছে?

না।

আর্ট গ্যালারি কেমন দেখলে?

চমৎকার। অপূর্ব!

আমি চায়ে চিনি মেশাতে-মেশাতে বললাম, তোমাদের প্রিন্সেস তারাকনোভাকে দেখে আমার এক পরিচিতা মহিলার কথা খুব মনে পড়ছে।

গাইড কৌতূহলী হয়ে বলল, কে সে? নাম জানতে পারি?

জরী তার নাম।

যোখভ বিস্মিত হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি মনে মনে বললাম, 'প্রিন্সেস জরী। প্রিন্সেস জরী।'

জরী, রাজকুমারীর ছবি দেখে আজ বড় অভিভূত হয়েছি। হঠাৎ করে তোমাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছা করছে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে। ক্রমাগতই নস্টালজিক হয়ে পড়ছি। ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। ঘনঘন কফি খাই। চুরুটের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। শেষরাতের দিকে ঘুমুতে গিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। পরশু রাত্রে কী স্বপ্ন দেখলাম জানো? দেখলাম, আমাদের নীলগঞ্জে যেন খুব বড় একটা মেলা বসেছে। বাবার হাত ধরে মেলা দেখতে গিয়েছি (ইশ! কতদিন পর বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম)। বাবা বললেন, 'খোকা নাগরদোলায় চড়বি?' আমি যতই না করি তিনি ততই জোর করেন। তারপর দেখলাম, ভয়ে আমি থরথর করে কাঁপছি আর শাঁ-শাঁ শব্দে নাগরদোলা উড়ে চলছে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ছাড়িয়ে দূরে-দূরে আরো দূরে। ঘুম ভেঙে দেখি চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে। চল্লিশ বছর বয়সে কেউ কি এমন করে কাঁদে?

আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি জরী। আজকাল খুব নীলগঞ্জে চলে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আগের মতো সন্ধ্যাবেলা পুকুরঘাটে বসে জোনাকি পোকার আলো জ্বালা দেখি।

মস্কোতে আজ আমার শেষ রাত। আগামীকাল ভোর চারটায় রওনা হব রুমানিয়ায়। খুব কষ্ট করে এক মাসের ভিসা জোগাড় করেছি। এই এক মাস খুব ঘুরে বেড়াব। তারপর ফিরে যাব মন্ট্রিলে নিজ আস্তানায়। বেশ একটা গতির জীবন বেছে নিয়েছি, তাই না? অথচ ছোটবেলায় এই আমিই হোস্টেলে যাবার সময় হলে কী মন খারাপ করতাম। হাসু চাচা আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে লাল গামছায় ঘনঘন চোখ মুছত। ধরা গলায় বলত, বড় মিয়া চিঠি দিয়েন গো।

আমার মনে হত—দুর ছাই, কী হবে পড়াশুনা করে। বাবা, হাসু চাচা এদের ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না।

প্রবল ঘরমুখো টান ছিল বলেই আজ হয়তো যাযাবর বৃত্তি বেছে নিতে হয়েছে। তাই হয়। তোমার জন্য প্রবল তৃষ্ণা পুষেছিলাম বলেই কি তোমাকে পাই নি? টেনটেলাসের গল্প জানো তো? তার চারদিকে পানির থই-থই সমুদ্র অথচ তাকেই কিনা আজীবন তৃষ্ণার্ত থাকতে হল।

জরী, তোমার কি মনে আছে বিয়ের পরদিন তোমাকে নিয়ে যখন নীলগঞ্জে আসি তুমি ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে খুব কেঁদেছিলে। তখন কার্তিকের শুরু। ধানীরঙের রোদে ঝলমল করছে চারদিক। হালকা হিমেল বাতাস। মনে আছে সেসব কথা? আমি বলেছিলাম, মাথাটা ভেতরে টেনে নাও জরী। কয়লার গুঁড়ো এসে চোখে পড়বে। তুমি বললে, পড়ুক।

কামরায় আমরা দুটি মাত্র প্রাণী। বরযাত্রীরা আমাদের একা থাকবার সুযোগ দিয়ে অন্য কামরায় উঠেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে ঝিকঝিক করে। বাতাসে তোমার লালচে চুল উড়ছে।

কী-একটা সেন্ট মেখেছ। চারপাশে তার চাপা সৌরভ। আমি গাঢ় স্বরে বলেছিলাম, ছিঃ জরী এত কাঁদছ কেন? কথা বল। আমার কথায় তুমি কী মনে করেছিলে কে জানে। লজ্জা পেয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেললে। সেইদিন কী গভীর আনন্দ আমাকে অভিভূত করেছিল। মনে হয়েছিল রহস্যমণ্ডিত এই রমণীটিকে পেয়েছি।

গৌরীপুরে গাড়ি অনেকক্ষণ হল্ট করল। একজন অন্ধ ভিখারি একতারা বাজিয়ে আমাদের কামরার সামনে খুব গান গাইতে লাগল, "ও মনা এই কথাটি না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।"

তুমি অবাক হয়ে বললে, কী সুন্দর গান। তারপর দুটি টাকা বের করে দিলে। ট্রেন ছাড়তেই জানালা দিয়ে অনেকখানি মাথা বের করে বললে, দেখুন দেখুন, কতগুলি বক একসঙ্গে উড়ে যাচ্ছে।

বক নয়। শীতের শুরুতে ঝাঁক বেঁধে বালিহাঁস উড়ে আসছিল। আগে দেখ নি কখনো, তাই খুব অবাক হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, বক নয় জরী। ওগুলি বালিহাঁস। আর শোন, আপনি আপনি করছ কেন? আমাকে তুমি করে বলবে।

ঐ হাঁসগুলি কোথায় যাচ্ছে?

বিলের দিকে।

আপনাদের নীলগঞ্জে বিল আছে?

আবার আপনি?

তুমি হেসে বললে, নীলগঞ্জে বিল আছে?

আমি বললাম, বল, তোমাদের নীলগঞ্জে বিল আছে ?

তুমি মুখ ফিরিয়ে হাসতে শুরু করলে। আমার মনে হল সুখ কোনো অলীক বস্তু নয়। এর জন্যে জীবনব্যাপী কোনো সাধনারও প্রয়োজন নেই। প্রভাতের সূর্যকিরণ বা রাতের জোছনার মতোই এও আপনাতেই আসে।

কিন্তু প্রিন্সেস তারাকনোভার ছবি দেখতে গিয়ে উল্টো কথা মনে হল। মনে হল সুখটুখ বলে কিছু নেই। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নিয়ে আমাদের কারবার। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম হতাশ রাজকুমারী পিটার্সবার্গের নির্জন সেলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। হু-হু করে বন্যার জল ঢুকছে ঘরে। রাজকুমারীর ঠোঁটের কোনায় কান্নার মতো অদ্ভুত এক হাসি ফুটে রয়েছে।

ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একসময় মনে হল রাজকুমারীকে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। জরীর মুখের আদল আসছে নাকি? পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল। না, জরীর সঙ্গে এ মুখের কোনো মিল নাই। জরীর মুখ গোলগাল। একটু আদুরে ভাব আছে। আর রাজকুমারীর মুখটি লম্বাটে ও বিষণ্ন। মনে আছে জরী, একবার তোমার একটি পোর্ট্রেট করেছিলাম। কিছুতেই মন ভরে না। ব্রাশ ঘসি আবার চাকু দিয়ে চেঁছে রঙ তুলে ফেলি। দু-মাসের মতো সময় লাগল ছবি শেষ হতে। পোর্ট্রেট দেখে তুমি হতভম্ব। অবাক হয়ে বললে, ও আল্লা চোখে সবুজ রঙ দিয়েছ কেন? আমার চোখ বুঝি সবুজ? আমি বললাম, একটু দূর থেকে দেখ।

তুমি অনেকটা দূরে সরে গেলে এবং চেঁচিয়ে বললে, কী সুন্দর! কী সুন্দর!

ছবি আঁকিয়ে হিসেবে জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু সেদিনকার সেই মুগ্ধ কণ্ঠ এখনো কানে বাজে।

সেই পোর্ট্রেটটি অনেকদিন আমার কাছে ছিল। তারপর বিক্রি করে দিলাম। ছবি দিয়ে কী হয় বল? তার উপর সেবার খুব টাকার প্রয়োজন হল। মিলানে গিয়েছি বন্ধুর নিমন্ত্রণে। গিয়ে দেখি বন্ধুর কোনো হদিশ নেই। ক'দিন আগেই নাকি বিছানাপত্র নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। কী করি, কী করি! সঙ্গে সম্বলের মধ্যে আছে ত্রিশটি আমেরিকান ডলার আর মনট্রিলে ফিরে যাবার একটি টুরিস্ট টিকিট। এর মধ্যে আবার আমার পুরানো অসুখ বুকে ব্যথা শুরু হল। শস্তা দরের এক হোটেলে উঠলাম। তবুও দুদিন যেতেই টাকাপয়সা সব শেষ। ছবি বিক্রি ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

এক সন্ধ্যায় বড় রাস্তার মোড়ে ছবি টাঙিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। কারোর যদি পছন্দ হয় কিনবে। ছবির মধ্যে আছে দুটি ওয়াটার কালার আর তেলরঙে আঁকা তোমার পোর্ট্রেট। ছবিগুলির মধ্যে 'নীলগঞ্জের জোছনা' নামের অপূর্ব একটি ওয়াটার কালার ছিল। আমাদের বাড়ির পেছনে চার-পাঁচটা নারকেল গাছ। দেখ নি তুমি? ঐ যে পুকুরপাড়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়েছিল। এক

জোছনা রাত্রিতে পুকুরের কালো জলে তাদের ছায়া পড়েছিল— তারই ছবি। চোখ ফেরানো যায় না এমন। অথচ বিক্রি হল শুধু তোমার পোর্ট্রেটটি। এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কিনলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে বললেন, কেন এই পোর্ট্রেটটা কিনলাম জানো?

না ম্যাডাম।

আমি যখন কিশোরী ছিলাম তখন এই ছবিটিতে যে– মেয়েটিকে তুমি এঁকেছ তার মতো সুন্দর ছিলাম, তাই কিনলাম।

আমি হেসে বললাম, আপনি এখনো সুন্দর।

ভদ্রমহিলা বললেন, এসো না আমার ঘরে। কফি করে খাওয়াব। এমন কফি সারা মিলান শহরে খুঁজেও পাবে না।

ভদ্রমহিলা আশাতীত দাম দিলেন ছবির। শুধু কফি নয়, রাতের খাবার খাওয়ালেন। তাঁর অল্পবয়সী নানান ছবি দেখালেন। সবশেষে পিয়ানো বাজিয়ে খুব করুণ একটি গান গাইলেন যার ভাব হচ্ছে— "হে প্রিয়তম, বসন্তের দিন শেষ হয়েছে। ভালোবাসাবাসি দিয়ে সে দিনকে দূরে রাখা গেল না।"

নিজের হাতে তোমার ছবি টানালাম। কোথাকার ইটালির মিলান শহরের এক বৃদ্ধা মহিলা, তার ঘরে তোমার হাসিমুখের ছবি ঝুলতে লাগল। কেমন অবাক লাগে ভাবতে।

একশ বছর পর এই ছবিটি অবিকৃতই থাকবে। বৃদ্ধার নাতি-নাতনিরা ভাববে, এইটি কার পোর্ট্রেট? এখানে কীভাবে এসেছে?

ফেরার পথে বৃদ্ধার হাতে চুমু খেলাম। মনে-মনে বললাম, আমার জরী যেন তোমার কাছে সুখে থাকে।

আমরা সবসময় সুখে থাকার কথা বলি। যতবার নীলগঞ্জ থেকে ঢাকার হোস্টেলে যেতাম— বাবা বলতেন, 'সুখে থাকো'। তুমি যখন লাল বেনারসীতে মুখ ঢেকে ট্রেনে উঠলে তোমার মা কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'সুখে থাকো'।

জরী, আমার কাছে তুমি সুখে ছিলে না? কিসে একটি মানুষ সুখী হয়? নীলগঞ্জে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ি দেখে তোমার কি মন ভরে উঠে নি? তুমি কি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠ নি— ওমা এ যে রাজপ্রাসাদ! জোছনা রাত্রিতে হাত ধরাধরি করে যখন আমরা পুকুরপাড়ে বেড়াতে যেতাম তখন কি গভীর আবেগ তোমাকে এতটুকু আচ্ছন্ন করে নি? তোমাকে আমি কী দেই নি জরী? নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসার দেয়ালে তোমাকে ঘিরে রেখেছিলাম। রাখি নি?

তবু এক রাত্রিতে তুমি বিছানা ছেড়ে চুপিচুপি ছাদে উঠে গেলে। আমি দেখলাম, তুমি পাথরের মূর্তির মতো কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছ। বুকে ধ্বক করে

একটা ধাক্কা লাগল। বিস্মিত হয়ে বললাম, কী হয়েছে জরী?

তুমি খুব স্বাভাবিক গলায় বললে, কই কিছু হয় নি তো। তারপর নিঃশব্দে নিচে নেমে এলে।

তোমার মধ্যে গভীর একটি শূন্যতা ছিল। আমি তা ধরতে পারি নি। শুধু বুঝতে পারছিলাম তোমার কোনোকিছুতেই মন লাগছে না। সে সময় 'এসো নীপবনে' নাম দিয়ে আমি চমৎকার একটি পেইনটিং করছিলাম। আকাশে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। একটি ভাঙা বাড়ির পাশে একটি প্রকাণ্ড ছায়াময় কদম গাছ। এই নিয়ে আঁকা। আমার শিল্পীজীবনের ভালো ক'টি ছবির একটি। ভেবেছিলাম বিয়ের বছরটি ঘুরে এলে তোমাকে এই ছবি দিয়ে মুগ্ধ করব। কিন্তু ছবি তোমাকে এতটুকুও মুগ্ধ করল না। তুমি ক্লান্ত গলায় বললে, এক বছর হয়ে গেছে বিয়ের? ইশ কত তাড়াতাড়ি সময় যায়!

তোমার কণ্ঠে কি সেদিন একটি চাপা বিষাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল? ক্রমে-ক্রমে তুমি বিষণ্ন হয়ে উঠতে লাগলে। প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে দেখতাম তুমি জেগে বসে আছ। অবাক হয়ে বলেছি, কী হয়েছে জরী?

কই? কিছু হয় নি তো।

ঘুম আসছে না?

আসছে।

বলেই তুমি আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লে। কিন্তু তুমি জেগে রইলে। অথচ ভান করতে লাগলে যেন ঘুমিয়ে আছ। আমি বললাম, জরী সত্যি করে বল তো তোমার কী হয়েছে?

কিছু হয় নি।

কোথাও বেড়তে যাবে?

কোথায়?

কক্সবাজার যাবে? হোটেল ভাড়া করে থাকব।

উঁহুঁ, ভাল্লাগে না।

আরো অনেকদিন পর এক সন্ধ্যায় ঘন ঘোর হয়ে মেঘ করল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ঝড়। দড়াম শব্দে একেকবার আছড়ে পড়ছে জানালার পাট। বাজ পড়ছে ঘনঘন। ঘরের লাগোয়া জামগাছে শোঁ-শোঁ শব্দ উঠছে। দুজনে বসে আছি চুপচাপ। তুমি হঠাৎ একসময় বললে, তোমাকে একটা কথা বলি, রাখবে?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কী কথা?

আগে বল রাখবে?

নিশ্চয়ই রাখব।

তুমি তখন আমাকে তোমার আনিস স্যারের গল্প বললে। যিনি কলেজে তোমাদের অঙ্কের প্রফেসর ছিলেন। খামখেয়ালির জন্যে যাঁর কলেজের চাকরিটি গেছে। এখন খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। কোনোরকমে দিন চলে। তুমি আমাকে অনুরোধ করলে নীলগঞ্জে নতুন যে কলেজ হচ্ছে সেখানে তাঁকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে।

তুমি উজ্জ্বল চোখে বললে, আনিস স্যার মানুষ নন। সত্যি বলছি ফেরেশতা। তুমি আলাপ করলেই বুঝবে।

আমি বললাম, নীলগঞ্জের কলেজের এখনো তো অনেক দেরি। মাত্র জমি নেয়া হয়েছে।

হোক দেরি। আনিস স্যার ততদিন থাকবে আমাদের এখানে। নিচের ঘর তো খালিই থাকে। একা মানুষ কোনো অসুবিধা হবে না।

একা মানুষ?

হুঁ। মেয়ে আর বউ দুজনের কেউই বেঁচে নেই। একদিনে দুজন মারা গেছে কলেরায়। আর মজা কী জানো? তার পরদিনই আনিস স্যার এসেছেন ক্লাস নিতে। প্রিন্সিপ্যাল স্যার বললেন, আজ বাড়ি যান। ক্লাস নিতে হবে না। আনিস স্যার বললেন, বাড়িতে গিয়ে করবটা কী? কে আছে বাড়িতে?

আমি বললাম, চিঠি লিখলেই কি তোমাদের স্যার আসবেন এখানে?

হ্যাঁ, আসবেন। আমি লিখলেই আসবেন। লিখব স্যারকে?

বেশ, লেখ।

তুমি সঙ্গে-সঙ্গে চিঠি লিখতে উঠে গেলে। সে চিঠি শেষ হতে অনেক সময় লাগল। বসে-বসে দেখলাম অনেক কাটাকুটি করলে। অনেক কাগজ ছিঁড়ে ফেললে। এবং এক সময় চিঠি শেষ করে হাসিমুখে উঠে এলে। তোমাকে সে রাতে ভীষণ উৎফুল্ল লাগছিল।

আহ, লিখতে-লিখতে কেমন যেন লাগছে। এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তবু ইচ্ছে হচ্ছে রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়াই। নিশি রাতে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে আমার বেশ লাগল। তুমি কি দস্তয়োভস্কির 'রূপালী রাত্রি' পড়েছ? রূপালী রাত্রিতে আমার মতো একজন নিশি-পাওয়া লোকের গল্প আছে।

জরী, তোমাদের স্যার কবে যেন উঠলেন আমাদের বাড়িতে? দিন-তারিখ এখন আর মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে মাঝবয়েসী একজন ছোটখাটো মানুষ ভোরবেলা এসে খুব হইচই শুরু করেছিলেন। চেঁচিয়ে রাগী ভঙ্গিতে ডাকছিলেন—

সুলতানা, সুলতানা। তুমি ধড়মড় করে জেগে উঠলে। "ও আল্লা, কী কাণ্ড, স্যার এসে পড়েছেন"—এই বলে খালি পায়েই ছুটতে-ছুটতে নিচে নেমে গেলে। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম তুমি পা ছুঁয়ে সালাম করছ, আর তোমার স্যার বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। খানিক পরে দেখলাম তিনি খুব হাসছেন। সেই সঙ্গে লাজুক ভঙ্গিতে তুমিও হাসছ।

তুমি খুশি হয়েছিলে তো? নিশ্চয়ই হয়েছিলে। আমি স্টুডিওতে বসে তোমার গভীর আনন্দ অনুভব করতে পারছিলাম। একটি তীব্র ব্যথা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেদিন আমার আত্মহত্যার কথা মনে হয়েছিল।

অথচ তোমার স্যার ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। এমন সহজ, এমন নির্লোভ লোক আমি খুব কমই দেখেছি। কোনোকিছুর জন্যেই কোনো মোহ নেই। এমন নির্লিপ্ততা কল্পনাও করা যায় না। জরী, তুমি ঠিক লোকের প্রেমেই পড়েছিলে। এমন মানুষকে ভালোবেসে দুঃখ পাওয়াতেও আনন্দ। তোমার স্যার ফেরেশতা ছিলেন কিন্তু জরী আমি তো ফেরেশতা নই। আমার হৃদয়ে ভালোবাসার সঙ্গে-সঙ্গে গ্লানি ও ঘৃণা আছে। আমি সত্যি একজন সাধারণ মানুষ।

সময় কাটতে লাগল। আমি শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। অনেকগুলি ছবি আঁকলাম সে সময়। তোমার পোর্ট্রেটটিও সে সময় করা। পোর্ট্রেটে সিটিং দেবার জন্যে ঘণ্টাখানিক বসতে হত তোমাকে। তুমি হাসিমুখে এসে বসতে কিন্তু অল্পক্ষণ পরই ছটফট করে উঠতে, "এই রে, স্যারকে চা দেয়া হয় নি। একটু দেখে আসি। এক মিনিট, প্লিজ।" আমি তুলি হাতে তোমার ফেরার প্রতীক্ষা করতাম। এক কাপ চা তৈরি করতে প্রচুর সময় লাগত তোমার।

মাঝে-মাঝে আসতেন তোমার স্যার। অর্ধ-সমাপ্ত ছবিগুলি দেখতেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এবং বলতেন, ছবি আমি ভালো বুঝি না। কিন্তু আপনি যে সত্যিই ভালো আঁকেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তাঁর প্রশংসা আমার সহ্য হত না। আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতাম। তিনি বলতেন, আপনি আঁকুন। আমি দেখি কী করে ছবি আঁকা হয়।

আমি কারো সামনে ছবি আঁকতে পারি না।

তবু তোমার স্যার বসে থাকতেন। তীব্র ঘৃণায় আমি কতবার তাঁকে বলেছি, এখানে বসে আছেন কেন? বাইরে যান।

কোথায় যাব?

নদীর ধারে যান। জরীকে সঙ্গে নিয়ে যান। কাজের সময় বিরক্ত করছেন কেন আপনি?

অপমানে তোমার মুখ কালো হয়ে উঠত। থমথমে স্বরে বলতে, চলুন স্যার আমরা যাই।

ক্রমে ক্রমেই তুমি সরে পড়তে শুরু করলে। পরিবর্তনটা খুব ধীরে হচ্ছিল। সে জন্যেই ঠিক বলতে পারব না কখন থেকে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলে। ব্যক্তিগত হতাশা ও বঞ্চনা— এই দুই মিলিয়ে মানসিক দিক দিয়ে অনেক আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে অসুখ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। একনাগাড়ে জ্বর চলল দীর্ঘদিন। ঘুম হয় না, বুকের মধ্যে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করি। তীব্র যন্ত্রণা।

অসুখ বিসুখে মানুষ খুব অসহায় হয়ে পড়ে। সে সময় একটি সুখকর স্পর্শের জন্যে মন কাঁদে। কিন্তু তুমি আগের মতোই দূরে-দূরে রইলে। যেন ভয়ানক একটি ছোঁয়াচে রোগে আমি শয্যাশায়ী। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে না চললে সমূহ বিপদ।

তোমার স্যার আসতেন প্রায়ই। আমি তাঁর চোখে গভীর মমতা টের পেতাম। তিনি আমার কপালে হাত রেখে নরম গলায় বলতেন, একটি গল্প পড়ে শুনাই আপনাকে? আপনার ভালো লাগবে।

আমি রেগে গিয়ে বলতাম, একা থাকতেই আমার ভালো লাগবে। আপনি নিচে যান। কেন বিরক্ত করছেন?

এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আমি একটু বসি এখানে। কথা বলি আপনার সঙ্গে?

না, না অসহ্য। আপনি জরীর সঙ্গে কথা বলুন।

আমার অসুখ সারে না কিছুতেই। বাবার বন্ধু শশধর ডাক্তার রোজ দু-বেলা আসেন আর গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়েন। বারবার জিজ্ঞেস করেন, হাঁপানির টান উঠে নাকি বাবা? হাঁপানি তোমাদের বংশের অসুখ। তোমার দাদার ছিল, তোমার বাবারও ছিল। শ্বাস নিতে কোনো কষ্ট টের পাও?

একটু যেন পাই।

ডাক্তার চাচা একটি মালিশের শিশি দিলেন। "শ্বাসের কষ্ট হলে অল্প-অল্প মালিশ করবে। সাবধান, মুখে যেন না যায়। তীব্র বিষ।" ছোট্ট একটি শিশিতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ তরল বিষ। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই শিশিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডাক্তার চাচা চলে যেতেই তোমাকে ডেকে বললাম, জরী এই শিশিটিতে কী আছে জানো?

জানি না কী আছে?

তীব্র বিষ! সাবধানে তুলে রাখো।

তোমাকে কেন বললাম এ-কথা কে জানে। কিন্তু বলবার পর দারুণ আত্মপ্রসাদ হল। দেখলাম তুমি সরু চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলে আমার দিকে। কী ভাবছিলে?

অসুখ সারল না। ক্রমেই বাড়তে থাকল। চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়ল। জন্ডিসের রুগীর মতো গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে গেল। দিনরাত শুয়ে থাকি। কত কী মনে হয়। কত সুখ-স্মৃতি, কত দুঃখ-জাগানিয়া ব্যথা। শ্লথ সময় কাটে। এক-এক রাতে ঘন ঘোর হয়ে বৃষ্টি নামে। ঝমঝম শব্দে গাছের পাতায় অপূর্ব সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। শুয়ে-শুয়ে শুনি তুমি নিচের ঘরে বৃষ্টির সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করছ। আহ্, কীসব দিন কেটেছে।

একটি প্রশস্ত ঘর। তার একপ্রান্তে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড একটি পালঙ্ক। সেখানে শয্যা পেতে রাতদিন খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে থাকা। কী বিশ্রী জীবন। ডাক্তার চাচা কতবার আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলেছেন, কেন তোমার অসুখ সারে না? বল, কেন?

আমি কী করে বলব?

যাও হাওয়া বদল করে আস। বউমাকে নিয়ে ঘুরে আস কক্সবাজার থেকে।

আচ্ছা যাব।

আচ্ছা নয়, কালই যাও। সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসে।

এত তাড়া কিসের?

তাড়া আছে। আমি বলছি বউমাকে সব ব্যবস্থা করতে।

ডাক্তার চাচা সেদিন অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, ও বউমা, বউমা।

তুমি তো প্রায় সময় থাকতে না, সেদিনও ছিলে না।

ডাক্তার চাচা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন সেদিন।

শুধু কি তিনি? এ বাড়ির সবক'টি লোক কৌতূহলী হয়ে দেখত আমাকে। আবুর মা গরম পানির বোতল আমার বিছানায় রাখতে-রাখতে নেহায়েত যেন কথার কথা এমন ভঙ্গিতে বলত, বিবি সাহেব নদীর পাড়ে বেড়াইতে গেছেন।

আমি বলতাম না কিছুই। অসহ্য বোধ হলে বিষের শিশিটির দিকে তাকাতাম। যেন সেখানে প্রচুর সান্ত্বনা আছে।

জরী, আমাদের এ বংশে অনেক অভিশাপ আছে। আমার দাদা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের হাতে খুন হয়েছিলেন। আমার মা'র মৃত্যুও রহস্যময়। লোকে বলে তাঁকে নাকি বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল। আমার সারাক্ষণ মনে হত পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেও করতে হবে।

জরী, আমার জরী, আহ্! কতদিন তোমাকে দেখি না। তোমার গোলগাল আদুরে মুখ কি এখনো আগের মতো আছে? না, তা কি আর থাকে? জীবন তো বহতা নদী। মাঝে মাঝে তোমার জন্যে খুব কষ্ট হয়। ইচ্ছে হয় আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে। ট্রেনে করে তুমি প্রথমবারের মতো নীলগঞ্জে আসছ সেখান থেকে। ঐ যে গৌরীপুরে ট্রেন থেমে থাকল অনেকক্ষণ। একজন অন্ধ ভিখিরি একতারা বাজিয়ে করুণ সুরে গাইলঃ

ও মনা
এই কথাটি না জানলে
প্রাণে বাঁচতাম না।
ও মনা। ও মনা।

তুমি ভিখিরিকে দুটি টাকা দিলে।

তোমার কথা মনে হলেই কষ্ট হয়। ভালোবাসার কষ্ট আমার চেয়ে বেশি কে আর জানবে বল? তোমার ব্যথা আমি সত্যি-সত্যি অনুভব করেছিলাম।

তোমার স্যার যেদিন নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, "সুলতানা, আমার স্যুটকেসটা গুছিয়ে দাও। আমি ভোরে যাচ্ছি।" তখন তোমার চোখে জল টলমল করে উঠল। তোমার স্যার সেদিকে লক্ষ্যও করলেন না। সহজ ভঙ্গিতে এসে বসলেন আমার বিছানার পাশে। গাঢ়স্বরে বললেন, আপনি জরীকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে কিছুদিন থাকুন। ভালো হয়ে যাবেন।

আমি বললাম, না-না আমি যাব না। সমুদ্র আমার ভালো লাগে না। আপনারা দুজনে যান। সমুদ্রতীরে সব সময় দুজন করে যেতে হয়। এর বেশিও নয়, এর কমও নয়।

তোমার স্যার তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলেন। তুমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলে। একটি কথাও বললে না। আমি দেখলাম, খুব শান্তভঙ্গিতে তুমি তোমার স্যারের স্যুটকেস গুছিয়ে দিলে। রাস্তায় খিদে পেলে খাবার জন্যে একগাদা কী-সব তৈরি করে দিলে। তিনি বিদায় নিলেন খুব সহজভাবেই। ঘর থেকে বেরিয়ে একবারও পিছনে ফিরে তাকালেন না। তুমি মূর্তির মতো গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলে।

জরী, তুমি ভুল লোকটিকে বেছে নিয়েছিলে। এইসব লোকের কোনো পিছুটান থাকে না। নিজ স্ত্রী-কন্যার মৃত্যুর পরদিন যে ক্লাস নিতে আসে তাকে কি আর ভালোবাসার শিকলে বাঁধা যায়?

তোমার স্যার চলে যাবার দিন আমি তোমাকে তীব্র অপমান করলাম। বিশ্বাস কর, ইচ্ছে করে করি নি। তোমার স্যার যখন বললেন, আপনার কাছে একটি জিনিস চাইবার আছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কী জিনিস?

আপনার আঁকা একটি ছবি আমি নিতে চাই। হাতজোড় করে প্রার্থনা করছি।

নিশ্চয়ই। আপনার পছন্দমতো ছবি আপনি উঠিয়ে নিন। যে-কোনো ছবি। যেটা আপনার ভালো লাগে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে আমার স্টুডিওর দিকে চলে গেলেন। আমি তোমার চোখে চোখ রেখে বললাম, স্যার কোন্ ছবিটি নেবেন জানো তুমি?

না।

স্যার নেবেন তোমার পোর্ট্রেট।

তিনি কিন্তু নিলেন অন্য ছবি। জলরঙে আঁকা 'এসো নীপবনে'। তাকিয়ে দেখি অপমানে তোমার মুখ নীল হয়ে গেছে। তীব্র ঘৃণা নিয়ে তুমি আমার দিকে তাকালে।

সেইসব পুরানো কথা তোমার কি মনে পড়ে? বয়স হলে সবাই তো নস্টালজিক হয়, তুমি হও নি? কুটিল সাপের মতো যে ঘৃণা তোমার বুকে কিলবিল করে উঠেছিল তার জন্যে তোমার কি কখনো কাঁদতে ইচ্ছা হয় না? তুমি কাঁদছ— এই ছবিটি বড় দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার স্যার চলে যাবার পর তুমি কী করবে তা কিন্তু আমি জানতাম জরী। তোমার তো এ ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। মিছিমিছি তুমি সারাজীবন লজ্জিত হয়ে রইলে।

আমি তোমাকে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছি। তুমি বলেছ, "না।" তোমাকে কিছুদিন তোমার বাবা-মা'র কাছে রেখে আসতে চেয়েছি। তুমি কঠিন স্বরে বলেছ, "না।" কতবার বলেছি, বাইরে থেকে ঘুরে এলে তোমার মন ভালো থাকবে। তুমি শান্তস্বরে বলেছ, আমার মন ভালোই আছে।

আমি জানতাম ঘৃণার দেয়ালে বন্দি হয়ে একজন মানুষ বেশিদিন থাকতে পারে না। তোমার সামনে দু'টি মাত্র পথ। এক মরে যাওয়া, আর দুই...। কিন্তু মরে যাওয়ার মতো সাহস তোমার ছিল না। কাজেই দ্বিতীয় পথ যা তুমি বেছে নেবে তার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। এও একধরনের খেলা। আমি জানতাম তুমি এবারও পরাজিত হবে। পরাজয়ের মধ্যেই আসবে জয়ের মালা। উৎকণ্ঠায় দিন কাটতে লাগল। কখন আসবে সেই মুহূর্তটি? সেই সময় আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারব তো?

সেই মুহূর্তটির কথা তোমার কি মনে পড়ে কখনো? ঘন হয়ে শীত পড়ছে। শরীর খানিক সুস্থ বোধ হওয়ায় আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি।

সন্ধ্যা মিলাতেই ঘরে আলো দিয়ে গেল। তারও কিছু পর তুমি এলে চা নিয়ে। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে গিয়ে চা ছলকে পড়ল মেঝেতে। বিড়বিড় করে তুমি কী যেন বললে। আমি তাকালাম টেবিলের দিকে। বিষের সেই শিশিটি নেই। তুমি অপলকে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলাম চায়ের পেয়ালার জন্যে। তুমি জ্ঞান হারিয়ে এলিয়ে পড়লে মেঝেতে। হেরে গেলে জরী।

তোমাকে এরপর খুব সহজেই জয় করা যেত। কিন্তু আমি তা চাই নি, সব ছেড়েছুড়ে চলে এলাম। অল্প ক'দিন আমরা বাঁচি। তবু এই সময়ে কত সুখ-দুঃখ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। কত গ্লানি, কত আনন্দ আমাদের চারপাশে নেচে বেড়ায়। কত শূন্যতা বুকের ভেতরে হা হা করে।

জরী, এখন গভীর রাত্রি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পোর্টার এসে দরজায় নক করবে। বিমান কোম্পানির মিনিবাস এসে দাঁড়াবে দোরগোড়ায়। আবার যাত্রা শুরু।

আবার হয়তো কোনো এক পেইন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কথা মনে পড়বে। আবার এরকম লম্বা চিঠি লিখব। কিন্তু সে সব চিঠি কখনো পাঠাব না তোমাকে। যৌবনে হৃদয়ের যে উত্তাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে নি, আজ কি আর তা পারবে? কেন আর মিছে চেষ্টা!

একটি নীল বোতাম

বারান্দায় এশার বাবা বসেছিলেন।

হাঁটু পর্যন্ত তোলা লুঙি, গায়ে নীল রঙের গেঞ্জি। এই জিনিস কোথায় পাওয়া যায় কে জানে? কী সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে। ভদ্রলোকের গায়ের রঙ ধবধবে শাদা। আকাশি রঙের গেঞ্জিতে তাঁর গায়ের রঙ ফুটে বেরুচ্ছে। সব মিলিয়ে সুখী-সুখী একটা ছবি। নীল রঙটাই বোধহয় সুখের। কিংবা কে জানে ভদ্রলোকের চেহারাটাই বোধহয় সুখী-সুখী। কালো রঙের গেঞ্জিতেও তাঁকে হয়তো সুখী দেখাবে।

তিনি আমাকে দেখতে পান নি। আমি ইচ্ছা করেই গেটে একটু শব্দ করলাম। তিনি আমাকে দেখলেন। সুন্দর করে হাসলেন। ভরাট গলায় বললেন, আরে রঞ্জু, তুমি? কী খবর? ভালো আছ?

জি ভালো।

গরম কী রকম পড়ছে বল দেখি?

খুব গরম।

আমার তো ইচ্ছা করছে চৌবাচ্চায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকি।

তিনি তাঁর পাশের চেয়ারে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। হাসি-হাসি মুখে বললেন, বসো। তোমার কাছ থেকে দেশের খবরাখবর কিছু শুনি।

আমার কাছে কোনো খবরাখবর নেই চাচা।

না থাকলে বানিয়ে-বানিয়ে বল। বর্তমানে চালু গুজব কী?

আমি বসলাম তাঁর পাশে। এশার বাবার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে। মাঝে-মাঝে এ-বাড়িতে এসে শুনি এশা নেই— মামার বাড়ি গেছে। রাতে ফিরবে না। তার মামার বাড়ি ধানমণ্ডিতে। প্রায়ই সে সেখানে যায়। আমার

খানিকটা মন-খারাপ হয়। কিন্তু এশার বাবার সঙ্গে কথা বললে আমার মন-খারাপ ভাবটা কেটে যায়।

এই যে এখন বসলাম উনার পাশে— এখন যদি শুনি এশা বাসায় নেই, মামার বাড়ি গিয়েছে— আমার খুব খারাপ লাগবে না।

তারপর রঞ্জু নতুন কোনো গুজবের কথা তাহলে জানো না?

জি না।

বল কী তুমি? শহর ভর্তি গুজব। আমি তো ঘরে বসে কত কী শুনি। চা খাবে?

জি না।

খাও এক কাপ। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। তুমি আরাম করে বসো। আমি চায়ের কথা বলে আসি।

আপনাকে বলতে হবে না, আমি বলে আসছি। এশা কি বাসায় নেই?

আছে। বাসাতেই আছে।

বলেই তিনি চায়ের কথা বলতে উঠে গেলেন। কী চমৎকার তাঁর এই ভদ্রতা। আমি কে? কেউ না। অতি সামান্য একজন। একটা এ্যাড ফার্মে কাজ করি। অল্প যে ক'টা টাকা পাই তার প্রতিটির হিসাব আমার আছে। আর এঁরা? আমার ধারণা, এদের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ান আমার চেয়ে বেশি টাকা পায়। নিতান্ত ভাগ্যক্রমে এঁদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে এ-বাড়িতে এসেছিলাম। প্রথমদিনেই এশার কী সহজ সুন্দর ব্যবহার যেন সে অনেকদিন থেকেই আমাকে চেনে। সেদিন কেমন হাসিমুখে বলল, আপনি তো বেশ লম্বা। আসুন একটা কাজ করে দিন। চেয়ারে দাঁড়ান. দাঁড়িয়ে খুব উঁচুতে একটা পেরেক লাগিয়ে দিন। আমি বললাম, এত উঁচুতে পেরেক দিয়ে কী করবেন?

আজ বলব না। আরেকদিন এসে দেখে যাবেন।

দ্বিতীয়বার এ বাড়িতে আসার কী চমৎকার অজুহাত তৈরি হল। অথচ অজুহাতের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এদের বাড়ি— দুয়ারখোলা বাড়ি। যে-কেউ যে-কোনো সময় আসতে পারে। কোনো বাধা নেই। অথচ মনে আছে দ্বিতীয়বার কত ভয়ে-ভয়ে এসেছি। গেট খুলে ভেতরে ঢোকার সাহস হয় নি। যদি আমাকে কেউ চিনতে না পারে। যদি এশা বিস্মিত হয়ে বলে, আপনি কাকে চান?

সে রকম কিছুই হল না। এশার বাবা আমাকে দেখে হাসি-মুখে বললেন, কী ব্যাপার রঞ্জু, গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আস, ভেতরে আস।

আমি খানিকটা বিব্রত ভঙ্গিতেই ঢুকলাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, দেশের খবরা-খবর বল। নতুন কী গুজব শুনলে?

এশা বোধহয় বাইরে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, বেছে-বেছে আজকের দিনটিতেই আপনি এলেন? এখন বেরুচ্ছি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। চট করে আসুন তো, পেরেকটা কী কাজে লাগছে দেখে যান।

আমি ইতস্তত করছি। এশার বাবার সামনে থেকে উঠে যাব, উনি কী মনে করেন কে জানে। উনি কিছুই মনে করলেন না। সুখী-সুখী গলায় বললেন, যাও দেখে আস। জিনিসটা ইন্টারেস্টিং।

পেরেক থেকে হলুদ দড়ির মতো একটা জিনিস মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে। এশা বাতি নিভিয়ে একটা সুইচ টিপতেই অদ্ভুত ব্যাপার হল। হলুদ দড়ি আলোয় ঝিকমিক করতে লাগল। সেই আলো স্থির নয়। যেন গড়িয়ে-গড়িয়ে নিচে নামছে। আলোর ঝরনা।

অপূর্ব!

কী, অবাক হয়েছেন তো?

হ্যাঁ, হয়েছি।

এ অদ্ভুত জিনিস এর আগে কখনো দেখছেন?

জি না।

আমার বড়বোন পাঠিয়েছেন। নেদারল্যান্ড থাকেন যিনি, তিনি। এখন যান। বসে বসে বাবার গল্প শুনুন। বাবা কি আপনাকে তার কচ্ছপের গল্পটা বলেছে?

জি না।

তাহলে হয়তো আজ বলবে। বাবার গল্প বলার একটা প্যাটার্ন আছে। কোন্‌টির পর কোন্ গল্প আসবে আমি জানি।

এশা হাসল। কী সুন্দর হাসি। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম— না জানি কোন্ ভাগ্যবান পুরুষ এই মেয়েটিকে সারাজীবন তার পাশে পাবে।

এশার বাবা সেদিন কচ্ছপের গল্প বললেন না। পরের বার যেদিন গেলাম সেদিন বললেন। কচ্ছপ কোথায় ডিম পাড়ে জানো তো রঞ্জু? ডাঙায়। সে নিজে থাকে কিন্তু পানিতে। চলাফেরা, জীবনযাত্রা সবই পানিতে অথচ তার মন পড়ে থাকে তার ডিমের কাছে ডাঙায়। ঠিক না?

জি ঠিক।

বুড়ো বয়সে মানুষেরও এই অবস্থা হয়। সে বাস করে পৃথিবীতে কিন্তু তার মন পড়ে থাকে পরকালে। আমার হয়েছে এই দশা।

এই পরিবারটির সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমার মধ্যে বড় ধরনের কিছু পরিবর্তন হল। আগে বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে চমৎকার লাগত। এখন আর লাগে না। একসময় মেয়েদের নিয়ে কেউ কোনো কুৎসিত কথা বললে বেশ মজা পেতাম। এখন ভয়ংকর রাগ লাগে। মনে হয় এই কুৎসিত কথাটি কোনো-না-কোনো ভাবে এশাকে স্পর্শ করছে। যে খুপরি ঘরটায় থাকি সেই ঘর আমার আর এখন ভালো লাগে না । দম বন্ধ হয়ে আসে। নোনাধরা বিশ্রী দেয়াল। একটি ছোট জানালা যা দিয়ে আলো-বাতাস আসে না, রাতের বেলা শুধু মশা ঢুকে। চৈত্র মাসের গরমে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। নানান রকম কল্পনা মাথায় আসে। কল্পনায় আমার এই ঘর হয়ে যায় পদ্মানদীর নৌকায় একটা ঘর। জানালা খুললেই নদী দেখা যায়। সেই নদীতে জোছনা হয়েছে। চাঁদের আলো ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। ঘরের দরজায় টোকা পড়ে। আমি জানি কে টোকা দিচ্ছে। তবু কাঁপা গলায় বলি, কে? এশা বলে, কে আবার? আমি। এরকম চমৎকার রাতে আপনি ঘরটর বন্ধ করে বসে আছেন। পাগল নাকি? আসুন তো।

কোথায় যাব?

কোথায় আবার, নৌকার ছাদে বসে থাকব।

আমরা নৌকার ছাদে গিয়ে বসি। মাঝি নৌকা ছেড়ে দেয়। এশা গুনগুন করে গায়ঃ যদি আমায় পড়ে তাহার মনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে। আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে।

সবই খুব সুন্দর সুখের কল্পনা। তবু এক-এক রাতে কষ্টে চোখে জল আসে । সারারাত জেগে বসে থাকি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবি, আমার এই জীবনটা আমি কি কিছুতেই বদলাতে পারি না?

বন্ধুবান্ধব সবাইকে অবাক করে এক সন্ধ্যায় জগন্নাথ কলেজের নাইট সেকশনের এমএ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাই। ধার-টার করে আমার ঘরের জন্যে নতুন পর্দা, বিছানার নতুন চাদর, নেটের মশারি কিনে ফেলি। অনেক ঘোরাঘুরি করে একটা ফুলদানি কিনি। একশ টাকা লেগে যায় ফুলদানিতে। তা লাগুক, তবু তো একটা সুন্দর জিনিস। একগুচ্ছ রজনীগন্ধা যখন এখানে রাখব তখন হয়তো এই ঘরের চেহারাও পাল্টে যাবে। আমার এক আর্টিস্ট বন্ধুর কাছ থেকে একদিন প্রায় জোর করে জলরঙা একটা ছবিও নিয়ে আসি। নোনাধরা দেয়ালে সেই ছবি মানায় না। নিজেই চুন এনে দেয়ালে চুনকাম করি।

চুন দেয়ালে আটকায় না, ঝরে-ঝরে পড়ে। তবু আমার ঘর দেখে বন্ধুরা চোখ কপালে তুলে।

করছিস কী তুই? ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছিস দেখি। আবার দেখি খুশবুও আসছে। বিছানায় আতর ঢেলে দিয়েছিস নাকি? মাই গড। মেয়েমানুষ ছাড়া এই ঘর মানায় না। এক কাজ কর একশ টাকা দিয়ে একটা মেয়েমানুষ এক রাতের জন্য নিয়ে আয়। ফুর্তি কর। আমরা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি।

রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। কিছু বলি না। কী হবে বলে। আমার বন্ধুরা গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়। সিগারেটের টুকরা দিয়ে মেঝে প্রায় ঢেকে ফেলে। একজন আমার নতুন কেনা বিছানায় চায়ের কাপ উল্টে দিয়ে বলে, যা শালা, চাঁদে কলঙ্ক লেগে গেল।

আমি কিছু বলি না। দাঁতে-দাঁত চেপে থাকি। আর মনে-মনে ভাবি— এই মূর্খদের সঙ্গে কী করে এতদিন কাটিয়েছি। কী করে এদের সহ্য করেছি?

ইরফান বলল, প্রেম করেছিস কিনা বল। তোর হাবভাব যেন কেমন রঙ্গিলা।

আমি জবাব দেই না। ইরফান পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে বলে, জিনিস কেমন বল। টিপে-টুপে দেখেছিস তো?

সবাই হো হো করে হাসে। কোন্ অন্ধকার নরকে এরা পড়ে আছে? এদের কী কোনোদিন মুক্তি ঘটবে না? আমার ইচ্ছা করে এশাকে একদিন ওদের সামনে উপস্থিত করি। সেটা নিশ্চয়ই খুব অসম্ভব নয়। বললেই সে আসবে। তবে আমার বলতে সাহস করে না।

প্রথম যেদিন তাকে 'তুমি' বললাম কী প্রচণ্ড ভয়ে-ভয়েই না বললাম। সে গোলাপগাছের ডাল ছেঁটে দিচ্ছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কী হল, নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম— কাঁচিটা আমার হাতে দাও, আমি ছেঁটে দি। বলেই মনে হল—এ কী করলাম আমি? আমার মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। আমার মনে হল সে এবার চোখে চোখে তাকিয়ে শীতল গলায় বলবে, আমাকে তুমি করে বলবেন না। এত ঘনিষ্ঠতা তো আপনার সঙ্গে আমার নেই।

এশা সে-রকম কিছুই বলল না। কাঁচি আমার হাতে দিয়ে বলল, তিন ইঞ্চি করে কাটবেন। এর বেশি না। আর আপনি কি চা খাবেন?

হ্যাঁ খাব।

চা নিয়ে আসছি। শুনুন, এরকম কচকচ করে কাটবেন না, ওরা ব্যথা পায়। গাছেরও জীবন আছে। জগদীশ চন্দ্র বসুর কথা।

এশা ঘরে ঢুকে গেল। চৈত্র মাসের বিকেলে আমি গোলাপ ছাঁটতে লাগলাম। আমার ত্রিশ বছর জীবনের সেটা ছিল শ্রেষ্ঠতম দিন। বিকালটাই যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। শেষ বিকেলের রোদকে মনে হল লক্ষ-লক্ষ গোলাপ, বাতাস

কী মধুর। এশার বাবা যখন বাইরে এসে বললেন— তারপর রঞ্জু দেশের খবর কী বল? নতুন কী গুজব শুনলে?—কী যে ভালো লাগল সেই কথাগুলি! মনে হল এরকম সুন্দর কথা এর আগে আমাকে কেউ বলে নি।

গোলাপের ডাল ছাঁটছ মনে হচ্ছে।

জি চাচা।

এর একটা ফিলসফিক আসপেকট আছে। সেটা লক্ষ্য করেছ? ফুল ফোটাবার জন্যে গাছকে কষ্ট দিতে হচ্ছে। হা-হা-হা।

তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও হাসলাম। এশা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, এত হাসাহাসি হচ্ছে কেন? আমি যোগ দিতে পারি?

ওদের বাড়ি থেকে ফিরলাম সন্ধ্যার পর। এশা গেট পর্যন্ত এল। হাসিমুখে বলল, আবার আসবেন।

এই কথাটি কি পৃথিবীর মধুরতম কথার একটি নয়? আমি আবার আসতে পারি এ বাড়িতে। যতবার ইচ্ছা আসতে পারি। আমাকে কোনো অজুহাত তৈরি করতে হবে না। তবুও ছোটখাটো কিছু অজুহাত আমি তৈরি করেই রাখি। যেমন একবার আমার একটা হ্যান্ডব্যাগ ফেলে এলাম যাতে পরদিন গিয়ে বলতে পারি, জরুরি কিছু কাগজপত্র ছিল। যাক পাওয়া গেল। সবচে বেশি যা করি তা হচ্ছে—গল্পের বই নিয়ে আসি। তারপর সেই বই ফেরত দিতে যাই।

গল্পের বই আমি পড়ি না। ভালো লাগে না। কোনোকালেও ভালো লাগে নি। তবু রাতে শুয়ে-শুয়ে বইয়ের ঘ্রাণ নেই, পাতা ওল্টাই। এশার স্পর্শ এই বইগুলির পাতায়-পাতায় লেগে আছে ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ বোধ হয়। গা শিরশির করে। গভীর আনন্দে চোখ ভিজে উঠে। বই ওল্টাতে-ওল্টাতে একরাতে অদ্ভুত এক কাণ্ড হল। টুক করে বইয়ের ভেতর থেকে কী যেন পড়ল। তাকিয়ে দেখি ছোট একটা নীল রঙের বোতাম। যেন একটা নীল অপরাজিতা। নাকের কাছে নিয়ে দেখি সত্যি গন্ধ আসছে। আমি গভীর মমতায় বোতামটা বালিশের নিচে রেখে দিলাম। সারারাত ঘুম হল না। কেবলি মনে হল একদিন-না-একদিন এশা আসবে এ বাড়িতে। আমি তাকে বলব, তুমি যে— ফুলটি আমাকে দিয়েছিলে সেটা এখনো ভালো আছে। কী সুন্দর গন্ধ। সে অবাক হয়ে বলবে, আমি আবার ফুল দিলাম কবে?

এর মধ্যে ভুলে গেলে? একটা নীল ফুল দিয়েছিলে না?

বলেন কী! নীল ফুল আমি কোথায় পাব?

আমি বালিশ সরিয়ে বোতামটা বের করে আনব। এশা বিস্মিত হয়ে বলবে— এটা বুঝি আপনার নীল ফুল? আমি বলব, বিশ্বাস না হলে গন্ধ শুঁকে দেখ।

এশার বাবা নিজেই দুকাপ চা নিয়ে ঢুকলেন। আমার বড় লজ্জা লাগল। আমি বললাম, ছিঃ ছিঃ আপনি কেন?

তিনি হেসে বললেন, তাতে কী হয়েছে। খাও, চা খাও। চিনি হয়েছে কিনা বল।

হয়েছে।

গুড। চিনি আমি নিজেই দিয়ে এনেছি। কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই ব্যস্ত।

কোনো উৎসব নাকি?

না, উৎসব কিছু না। মেয়েলি ব্যাপার। এশার বিয়ে ঠিক হল। ওরা দিন পাকা করতে আসবে। রাত আটটায় আসবে। এখনো তিন ঘণ্টা দেরি অথচ ভাব দেখে মনে হচ্ছে ...।

আমি নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলাম। এশার বাবা বললেন, ব্যারিস্টার ইমতিয়াজ সাহেবের ছেলে। তুমি চিনবে নিশ্চয়ই। ইমতিয়াজ চৌধুরী, জিয়ার আমলে হেলথ মিনিস্টার ছিলেন। ছেলেটা খুব ভালো পেয়েছি। জার্মানি থেকে পিএইচ. ডি. করেছে ক্যামিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। এখন দেশে কী সব ইন্ডাস্ট্রি দেবে। রঙ তৈরি করবে। আমি ঠিক বুঝিও না।

চা শেষ করবার পরও আমি খানিকক্ষণ বসে রইলাম। যাবার আগে এশা বেরিয়ে এল। কী চমৎকার করেই না আজ তাকে সাজিয়েছে। তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হয়। এশা হাসিমুখে বলল, বেছে-বেছে আপনি ঝামেলার দিনগুলিতে আসেন কেন বলুন তো?

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার খুপরি ঘরে। অন্যসব রাতের মতো আজ রাতেও হয়তো ঘুম হবে না। বালিশের নিচ থেকে নীল বোতাম বের করে আজো নিশ্চয়ই দেখব। এই পরিবারটির কাছ থেকে একটা নীল বোতামের বেশি পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। এই সহজ সত্যটি আজ রাতেও আমার মাথায় ঢুকবে না। আজ রাতেও বোতামটিকে মনে হবে একটি অপরাজিতা ফুল।

দ্বিতীয় জন

প্রিয়াংকার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ হয়েছে।

অসুখটা এমন যে কাউকে বলা যাচ্ছে না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিংবা বিশ্বাস করার ভান করে আড়ালে হাসাহাসি করবে। একজনকে অবিশ্যি বলা যায় — জাভেদকে। জাভেদ তার স্বামী। স্বামীর কাছে কিছুই গোপন থাকা উচিত নয়। অসুখ-বিসুখের খবর সবার আগে স্বামীকেই বলা দরকার।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জাভেদের সঙ্গে প্রিয়াংকার পরিচয় এখনো তেমন গাঢ় হয় নি। হবার কথাও নয়। তাদের বিয়ে হয়েছে একুশ দিন আগে। এখনো প্রিয়াংকার 'তুমি' বলা রপ্ত হয় নি। মুখ ফসকে 'আপনি' বলে ফেলে। এরকম গম্ভীর, বয়স্ক একজন মানুষকে 'তুমি' বলাও অবিশ্যি খুব সহজ নয়। মুখে কেমন বাধো-বাধো ঠেকে। প্রিয়াংকা চেষ্টা করে 'আপনি' 'তুমি' কোনোটাই না বলে চালাতে, যেমন— 'তুমি চা খাবে?' না বলে— 'চা দেব?' এইভাবে দীর্ঘ আলাপ চালানো যায় না, তার চেয়েও বড় কথা— মানুষটা খুব বুদ্ধিমান। ভাববাচ্য কিছুক্ষণ কথা বলার পরই সে হাসিমুখে বলে, তুমি বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না?

তুমি বলতে কষ্ট হওয়াটা দোষের কিছু না। প্রিয়াংকার বয়স মাত্র সতেরো। তাও পুরোপুরি সতেরো হয় নি। জুন মাসে হবে। এখনো দুমাস বাকি। আর ঐ মানুষটার বয়স খুব কম ধরলেও ত্রিশ। তার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। সারাক্ষণ গম্ভীর থাকে বলে বয়স আরো বেশি দেখায়। বরের বয়স বেশি বলে প্রিয়াংকার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। বরদের চেংড়া দেখালে ভালো লাগে না। তাছাড়া মানুষটা অত্যন্ত ভালো। ভালো এবং বুদ্ধিমান। কমবয়েসী বোকা বরের চেয়ে বুদ্ধিমান বয়স্ক বর ভালো।

বিয়ের রাতে নানা কিছু ভেবে প্রিয়াংকা আতঙ্কে অস্থির হয়েছিল। ধ্বকধ্বক করে বুক কাঁপছিল। কপাল রীতিমতো ঘামছিল। মানুষটা সঙ্গে-সঙ্গে তা বুঝে ফেলেছিল। কাছে এসে ভারী গলায় বলল, ভয় করছে? ভয়ের কী আছে বল তো?

প্রিয়াংকার বুকের ধ্বকধ্বকানি আরো বেড়ে গেল। সে 'হাঁ' 'না' কিছুই বলল না। একবার মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা তখন নরম গলায় বলল, ভয়ের কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়। বলেই প্রিয়াংকার গায়ে চাদর টেনে দিল। তাঁর গলার স্বরে কিছু- একটা ছিল। প্রিয়াংকার ভয় পুরোপুরি কেটে গেল এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে একবার ঘুম ভেঙে দেখে লোকটি অন্যপাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। খানিকক্ষণ জেগে থেকে প্রিয়াংকা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। লোকটি তখন পাশে নেই।

একটা মানুষকে চেনার জন্যে একুশ দিন খুব দীর্ঘ সময় নয়। তবু প্রিয়াংকার ধারণা মানুষটা ভালো, বেশ ভালো। এরকম একজন মানুষকে তার অসুখের কথাটা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অসুখটার সঙ্গে এই মানুষটার সম্পর্ক আছে। এই কারণেই তাঁকে বলা যাবে না। কিন্তু কাউকে বলা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি বলা দরকার। নয়তো সে পাগল হয়ে যাবে। কিছুটা পাগল সে বোধহয় হয়েই গেছে। সারাক্ষণ অস্থির লাগে। সন্ধ্যা মেলাবার পর শরীর কাঁপতে থাকে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেলেও তৃষ্ণা মেটে না। সামান্য শব্দে ভয়ংকর চমকে উঠে। সেদিন বাতাসে জানালার কপাট নড়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে অস্থির হয়ে গোঙানির মতো শব্দ করল প্রিয়াংকা। হাতের চায়ের কাপ থেকে সবটা চা ছলকে পড়ল শাড়িতে। ভাগ্যিস আশেপাশে কেউ ছিল না। কেউ থাকলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হত। প্রিয়াংকার ছোটমামা যেমন অবাক হলেন।

তিনি প্রিয়াংকাকে দেখতে এসেছিলেন। তার দিকে তাকিয়েই বিস্মিত গলায় বললেন, তোর কী হয়েছে রে?

প্রিয়াংকা হালকা গলায় বলল, কিছু হয় নি তো। তুমি কেমন আছ মামা?

'আমার কথা বাদ দে। তোকে এমন লাগছে কেন?'

'কেমন লাগছে?'

'চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ শুকনো। কী ব্যাপার?'

'কোনো ব্যাপার না মামা।'

'গাংটাল ভেঙে কী অবস্থা। তুই কথাও তো কেমন অন্য রকমভাবে বলছিস।'

'কী রকমভাবে বলছি?'

'মনে হচ্ছে তোর গলাটা ভাঙা।'

'ঠাণ্ডা লেগেছে মামা।'

প্রিয়াংকা কয়েকবার কাশল। মামাকে বুঝাতে চাইল যে তার সত্যি-সত্যি কাশি হয়েছে, অন্য কিছু না। মামা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। শীতল গলায় বললেন,

'আর কিছু না তো?'

'না।'

'ঠিক করে বল।'

'ঠিক করেই বলছি।'

প্রিয়াংকার কথায় তার মামা খুব আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। চায়ের কাপে দুটা চুমুক দিয়েই রেখে দিলেন। 'যাইরে মা।' বলেই কোনোদিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। মামা চলে যাবার এক ঘণ্টার ভেতরই মামি এসে হাজির। বোঝাই যাচ্ছে মামা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মামি প্রিয়াংকাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। প্রায় চেঁচিয়েই বললেন, এক সপ্তাহ আগে তোকে কী দেখেছি আর এখন কী দেখছি? কী ব্যাপার তুই খোলাখুলি বল্ তো? কী সমস্যা?

প্রিয়াংকা শুকনো হাসি হেসে বলল, কোনো সমস্যা না।

মামি কঠিন গলায় বললেন,

তুই বলতে না চাইলে আমি কিন্তু জামাইকে জিজ্ঞেস করব। জামাই আসবে কখন?

'ও আসবে রাত আটটার দিকে। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না মামি। আমি বলছি।'

'বল। কিছু লুকুবি না।'

প্রিয়াংকা প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমি ভয় পাই, মামি।

'কিসের ভয়?'

'কী যেন দেখি।'

'কী দেখিস?'

'নিজেও ঠিক জানি না কী দেখি।'

'ভাসা-ভাসা কথা বলবি না। পরিষ্কার করে বল্ কী দেখিস।'

প্রিয়াংকা এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, মামি আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। আমি কী সব যেন দেখি।

সে কী দেখে তা তিনি অনেক প্রশ্ন করেও বের করতে পারলেন না। প্রিয়াংকা অন্য সব প্রশ্নের জবাব দেয় কিন্তু কী দেখে তা বলে না। এড়িয়ে যায় বা কাঁদতে শুরু করে।

'তোর কি বর পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে কি তোকে ভয়-টয় দেখায়?'

'কী যে তুমি বল মামি, আমাকে ভয় দেখাবে কেন?'

'রাতে কি তোরা একসঙ্গে ঘুমাস?'

প্রিয়াংকা লজ্জায় বেগুনি হয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ।

'সে কি তোকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে?'

'কী সব প্রশ্ন তুমি কর মামি?'

'আমি যা বলছি তার জবাব দে।'

'না জাগিয়ে রাখে না।'

মামি অনেকক্ষণ থাকলেন। প্রিয়াংকাদের ফ্ল্যাট ঘুরে-ঘুরে দেখলেন। কাজের মেয়ে এবং কাজের ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন। কাজের মেয়েটির নাম মরিয়ম। দেশ খুলনা। ঘরের যাবতীয় কাজ সে-ই করে। কাজের ছেলেটির নাম জীতু মিয়া। তার বয়স নয়-দশ। এদের দুজনের কাছ থেকেও খবর বার করার চেষ্টা করা হল।

'আচ্ছা মরিয়ম তুমি কি ভয়-টয় পাও?'

'না। ভয় পামু ক্যা?'

'রাতে কিছু দেখ-টেখ না?'

'কী দেখুম?'

'আচ্ছা ঠিক আছে—যাও।'

প্রিয়াংকার মামি কোনো রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। তার খুব ইচ্ছা ছিল জাভেদের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করবেন, পরামর্শ করবেন। প্রিয়াংকার জন্যে পারা গেল না। সে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, মামি তুমি যদি তাকে কিছু বল তাহলে আমি কিন্তু বিষ খাব। আল্লাহ্‌র কসম বিষ খাব। নয়তো ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব।

তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ, প্রিয়াংকা সত্যি বিষ-টিষ খেয়ে ফেলতে পারে। "আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়"—এই কথা লিখে একবার

সে এক বোতল ডেটল খেয়ে ফেলেছিল। অনেক ডাক্তার-হাসপাতাল করতে হয়েছে। এই কাণ্ড সে করেছিল অতি তুচ্ছ কারণে। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া করে। এই মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। তাকে কিছুতেই ঘাঁটানো উচিত নয়।

জাভেদ এল রাত সাড়ে আটটার দিকে। জাভেদের সঙ্গে খানিকক্ষণ টুকটাক গল্প করে প্রিয়াংকার মামি ফিরে গেলেন। তাঁর মনের মেঘ কাটল না। হল কী প্রিয়াংকার? সে কী দেখে?

প্রিয়াংকা নিজেও জানে না তার কী হয়েছে। মামি চলে যাবার পর তার বুক ধ্বক-ধ্বক করা শুরু হয়েছে। অল্প-অল্প ঘাম হচ্ছে। অসম্ভব গরম লাগছে। কিছুক্ষণ পরপর মনে হচ্ছে বোধহয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

তারা খাওয়াদাওয়া করে রাত সাড়ে দশটার দিকে ঘুমুতে গেল। জাভেদ বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আজো তাই হল। জাভেদ ঘুমুচ্ছে। তালে-তালে নিশ্বাস পড়ছে। জেগে আছে প্রিয়াংকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পানির পিপাসা পেল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা। পানি খাবার জন্য বিছানা ছেড়ে নামতে হবে। যেতে হবে পাশের ঘরে কিন্তু তা সে করবে না। অসম্ভব। কিছুতেই না। পানির তৃষ্ণায় মরে গেলেও না। এই পানি খেতে গিয়েই প্রথমবার তার অসুখ ধরা পড়েছিল। ভয়ে ঐদিনই সে মরে যেত। কেন মরল না? মরে গেলেই ভালো হত। তার মতো ভিতু মেয়ের মরে যাওয়াই উচিত।

ঐ রাতে সে বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি হবার জন্যে চারদিক বেশ ঠাণ্ডা। জানালা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। ঘুমুবার জন্যে চমৎকার রাত। এক ঘুমে সে কখনো রাত পার করতে পারে না। মাঝখানে একবার তাকে উঠে পানি খেতে হয় কিংবা বাথরুমে যেতে হয়। সেই রাতেও পানি খাবার জন্যে উঠল। জাভেদ কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে রেখেছে। অদ্ভুত অভ্যাস মানুষটার। যত গরমই পড়ুক গায়ে চাদর দিয়ে রাখবে। প্রিয়াংকা খুব সাবধানে গায়ের চাদর সরিয়ে দিল। আহা, আরাম করে ঘুমুক। কেমন ঘেমে গেছে।

স্বামীকে ডিঙিয়ে বিছানা থেকে নামল। স্বামী ডিঙিয়ে উঠানামা করা ঠিক হচ্ছে না —হয়তো পাপ হচ্ছে। কিন্তু উপায় কী। প্রিয়াংকা ঘুমায় দেয়ালের দিকে। খাট থেকে নামতে হলে স্বামীকে ডিঙাতেই হবে।

তাদের শোবার ঘর অন্ধকার, তবে পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। এই একটা বাতি সারারাতই জ্বলে। ঘরটা জাভেদের লাইব্রেরি ঘর। এই ঘরেই জাভেদ পরীক্ষার খাতা দেখে, পড়াশোনা করে। ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা বুক-শেলফে কিছু বই, পুরনো ম্যাগাজিন। একটা বড় টেবিলের উপর

রাজ্যের পরীক্ষার খাতা। একটা ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারের পাশে সাইড টেবিলে টেবিলে ল্যাম্প।

দরজার ফাঁক দিয়ে স্টাডি রুমের আলোর কিছুটা প্রিয়াংকাদের শোবার ঘরেও আসছে। তবুও ঘরটা অন্ধকার— স্যান্ডেল খুঁজে বের করতে অনেকক্ষণ মেঝে হাতড়াতে হল। স্যান্ডেল পায়ে পরামাত্র পাশের ঘরে কিসের যেন একটা শব্দ হল।

ভারী অথচ মৃদু গলায় কেউ একজন কাশল, ইজিচেয়ার টেনে সরাল। নিশ্চয়ই মনের ভুল। তবু প্রিয়াংকা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না, আর কোনো শব্দ নেই। শুধু সদর রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ট্রাক যাওয়া-আসা করছে। তাহলে একটু আগে পাশের ঘরে কে শব্দ করছিল? অবিকল নিশ্বাস নেবার শব্দ। প্রিয়াংকা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকেই জমে পাথর হয়ে গেল। ইজিচেয়ারে জাভেদ বসে আছে। হাতে বই। জাভেদ বই থেকে মুখ তুলে তাকাল। নরম গলায় বলল, কিছু বলবে?

কতটা সময় পার হয়েছে? এক সেকেন্ডের একশ ভাগের এক ভাগ না অনন্তকাল? প্রিয়াংকা জানে না। সে শুধু জানে সে ছুটে চলে এসেছে শোবার ঘরে— ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিছানায়। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। সে কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ঘর দুলছে। চারদিকের বাতাস অসম্ভব ভারী ও উষ্ণ। জাভেদ জেগে উঠেছে। সে বিছানায় পাশ ফিরতে-ফিরতে বলল, কী?

প্রিয়াংকা বলল, কিছু না। জাভেদ ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, ঘুমাও। জেগে আছ কেন? বলতে-বলতেই ঘুমে জাভেদ এলিয়ে পড়ল। জাভেদকে জড়িয়ে ধরে সারারাত জেগে রইল প্রিয়াংকা। একটি দীর্ঘ ও ভয়াবহ রাত। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে প্রিয়াংকা শুয়ে আছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় পাশের ঘরে। সে স্পষ্টই শুনছে ছোটখাটো শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে। নিশ্বাস ফেলার শব্দ, বইয়ের পাতা ওল্টাবার শব্দ, ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে যেমন ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয় সেরকম শব্দ, গলায় শ্লেষ্মা পরিষ্কার করার শব্দ। শেষ রাতের দিকে শোনা গেল বারান্দায় পায়চারির শব্দ। কেউ-একজন বারান্দায় এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। এইসব কি কল্পনা? নিশ্চয়ই কল্পনা। রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ আসছে না।

ফজরের আজানের পর প্রিয়াংকার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। ঘুম ভাঙল বেলা সাড়ে ন'টায়। ঘরের ভেতর রোদ ঝলমল করছে। জাভেদ চলে গেছে কলেজে। মরিয়ম, জীতু মিয়ার সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। প্রিয়াংকার সব ভয় কর্পূরের মতো উড়ে গেল। রাতে সে যে অসম্ভব ভয় পেয়েছিল এটা ভেবে এখন নিজেরই

কেমন হাসি পাচ্ছে। সে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। মানুষ কত রকম দুঃস্বপ্ন দেখে। এও একটা দুঃস্বপ্ন। এর বেশি কিছু না। মানুষ তো এরচেয়েও ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে। যে, নিজেই কতবার দেখেছে। একবার স্বপ্নে দেখেছিল—সম্পূর্ণ নগ্ন গায়ে বাসে করে কোথায় যেন যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ কী ভয়ংকর স্বপ্ন!

প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামতে-নামতে ডাকল, মরিয়ম।

'জে আম্মা।'

'ঝগড়া করছ কেন মরিয়ম?'

'জীতু কাচের জগটা ভাইঙ্গা ফেলছে আম্মা।'

'চিৎকার করলে তো জগ ঠিক হবে না। চিৎকার করবে না।'

'জিনিসের উপর কোনো মায়া নাই ... মহব্বত নাই ...'

'ঠিক আছে, তুমি চুপ কর। তোমার স্যার কি চলে গেছেন?'

'জে।'

'বাজার করে দিয়ে গেছেন?'

'জে।'

'কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন?'

'দুপুরে খাইতে আসবেন।'

'আচ্ছা যাও। তুমি আমার জন্য খুব ভালো করে এক কাপ চা বানিয়ে আনো।'

'নাশতা খাইবেন না আম্মা?'

'না। তোমার স্যার নাশতা করেছে?'

'জে।'

মরিয়ম চা আনতে গেল। প্রিয়াংকা মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসল। এখন তার করার কিছুই নেই। দুজন মানুষের সংসার। কাজ তেমন কিছু থাকে না। এ-সংসারে কাজকর্ম যা আছে সবই মরিয়ম দেখে এবং খুব ভালোমতোই দেখে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া প্রিয়াংকার কোনো কাজ নেই। এই ফ্লাটে অনেক গল্পের বই আছে— গল্পের বই পড়তে প্রিয়াংকার ভালো লাগে না। ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনা করা দরকার। পড়তে ভালো লাগে না, কারণ প্রিয়াংকা জানে পড়ে লাভ হবে না। সে পাস করতে পারবে না। কোনো একটা কলেজেই তাকে বি. এ. পড়তে হবে। কে জানে হয়তো জাভেদের কলেজেই। যদি তাই হয় তাহলে জাভেদ কী তাকে পড়াবে? ক্লাসে তাকে কী ডাকবে— স্যার?

চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মরিয়ম তাকে একটা চিঠি দিল।

'কিসের চিঠি মরিয়ম?

'স্যার দিয়া গেছে।'

চিঠি না— চিরকুট। জাভেদ লিখেছে— প্রিয়াংকা, তোমার গা-টা গরম মনে হল। তৈরি হয়ে থেকো। আমি দুপুরে তোমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

প্রিয়াংকার মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। মানুষটা ভালো। হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান। স্বামীদের কতরকম অন্যায় দাবি থাকে— তাঁর তেমন কিছু নেই। অন্যদের দিকেও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রিয়াংকা কেন, আজ যদি জীতু মিয়ার জ্বর হয় তাকেও সে সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। জাভেদ এমন একজন স্বামী যার উপর ভরসা করা যায়।

যে যাই বলুক, এই মানুষটাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তার খুব লাভ হয়েছে। জাভেদের আগে একবার বিয়ে হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। বেচারার স্ত্রী মারা গেছে বিয়ের আট মাসের মাথায়। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সে বিয়ে করার জন্যেও অস্থির হয়ে পড়ে নি। দুবছর অপেক্ষা করেছে। মামা-মামি যে তাকে দোজবর একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন এই নিয়েও প্রিয়াংকার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। মামা দরিদ্র মানুষ। তিনি আর কত করবেন। যথেষ্টই তো করছেন। মামি নিজের গয়না ভেঙে তাকে গয়না করে দিয়েছেন। ক'জন মানুষ এরকম করে? আট ন'টা নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছেন। এর মধ্যে একটা শাড়ি আছে বারোশ' টাকা দামের।

জাভেদের আগের স্ত্রীর অনেক শাড়ি এই ঘরে রয়ে গেছে। ঐ মেয়েটির শাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় খুব শৌখিন মেয়ে ছিল। ড্রেসিং টেবিল ভর্তি সাজগোজের জিনিস। কিছুই ফেলে দেয়া হয় নি। বসার ঘরে মেয়েটির বড় একটি বাঁধানো ছবি আছে। খুব সুন্দর মুখ। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এই ডাক্তার জাভেদের বন্ধু।

কাজেই ডাক্তার অনেক আজেবাজে রসিকতা করল—যেমন হাসিমুখে বলল, ভাবীকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সংসারে নতুন কেউ আসছে নাকি? হা-হা-হা। বুদ্ধিমান হয়ে ঠিক কাজটি করে ফেলেন নি তো?

দুসপ্তাহও হয় নি যার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে কী এরকম রসিকতা করা যায়? রাগে প্রিয়াংকার গা জ্বলতে লাগল।

ডাক্তার তাকে একগাদা ভিটামিন দিলেন এবং বললেন, ভাবীকে মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে-টুমুতে দেয় না? দুপুরে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবেন। নয়তো শরীর খারাপ করবে— হা-হা-হা।

প্রিয়াংকা বাড়ি ফিরল রাগ করে। সন্ধ্যা মেলাবার পর সেই রাগ ভয়ে রূপান্তরিত হল। সীমাহীন ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল। এ-ঘর থেকে ও-ঘর যেতে ভয়। বারান্দায় যেতে ভয়। হাতমুখ ধুতে বাথরুমে গিয়েছে—বাথরুমের দরজা বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল আর সে দরজা খুলতে পারবে না। দরজা আপনাআপনি আটকে গেছে। সে দরজা খোলার চেষ্টা না করেই কাঁপা গলায় ডাকতে লাগল—মরিয়ম, ও মরিয়ম। মরিয়ম।

রাতে আবার ঐদিনের মতো হল। জাভেদ পাশেই প্রায় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আর প্রিয়াংকা স্পষ্টই শুনছে স্যান্ডেল পরে বারান্দায় কে যেন পায়চারি করছে। প্রিয়াংকা নিজেকে বুঝাল— ও কেউ না, ও হচ্ছে মরিয়ম। মরিয়ম হাঁটছে। ছোট-ছোট পা ফেলছে। মরিয়ম ছাড়া আর কে হবে। নিশ্চয়ই মরিয়ম। স্যান্ডেলে কেমন ফটফট শব্দ হচ্ছে। জাভেদ যখন স্যান্ডেল পরে হাঁটে তখন এরকম শব্দ হয় না। একবার কি বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখবে? কী হবে উঁকি দিলে? কিছুই হবে না। ভয়টা কেটে যাবে। রাত একটা বাজে— এমন কিছু রাত হয় নি। রাত একটায় ঢাকা শহরের অনেক দোকান-পাট খোলা থাকে। এই তো পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটা কাঁদছে। এখন নিশ্চয়ই বারান্দায় যাওয়া যায়।

খুব সাবধানে জাভেদকে ডিঙিয়ে প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামল। তার হাত-পা কাঁপছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কানের কাছে কেমন ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ হচ্ছে। সব অগ্রাহ্য করে বারান্দায় চলে এল। আর তার সঙ্গে-সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষটা বলল, প্রিয়াংকা এক গ্লাস পানি দাও তো।

বিছানায় যে— মানুষটা শুয়ে আছে এই মানুষটাই সেই জাভেদ। আর পরনে জাভেদের মতোই লুঙি, হাতকাটা গেঞ্জি। মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ন।

প্রিয়াংকা ছুটে শোবার ঘরে চলে এল। কোনোমতে বিছানায় উঠল— ঐ তো জাভেদ ঘুমুচ্ছে— গায়ে চাদর টানা। এতক্ষণ যা দেখেছি ভুল দেখেছি। যা শুনেছি তাও ভুল। কিছু-একটা আমার হয়েছে। ভয়ংকর কোনো অসুখ। সকাল হলে আমার এই অসুখ থাকবে না। আল্লাহ, তুমি সকাল করে দাও। খুব তাড়াতাড়ি সকাল করে দাও। সব মানুষ জেগে উঠুক। সূর্যের আলোয় চারদিকে ভরে যাক। সে জাভেদকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। জাভেদ ঘুম-ঘুম গলায় বলল, কী হয়েছে?

সকালবেলা সত্যি-সত্যি সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। রাতে এরকম ভয় পাওয়ার জন্যে লজ্জা লাগতে লাগল। জাভেদ কলেজে চলে যাবার পর সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মরিয়মকে তরকারি কাটায় সাহায্য করতে গেল। মরিয়ম বলল,

'আফার শইল কী খারাপ?'

'না।'

'আফনের কিছু করণ লাগত না আফা। আফনে গিয়া হুইয়া থাকেন।'

'এইমাত্র তো ঘুম থেকে উঠলাম এখন আবার কী শুয়ে থাকব?'

'চা বানায়া দেই?'

'দাও। আচ্ছা মরিয়ম, তোমার আগের আপাও কি আমার মতো চা খেত?'

'হ। তয় আফনের মতো চুপচাপ থাকত না। সারাদিন হইচই করত। গান-বাজনা করত।'

'মারা গেলেন কীভাবে?'

'হঠাৎ মাথাডা খারাপ হইয়া গেল। উল্টাপাল্টা কথা কওয়া শুরু করল—কী জানি দেখে।'

প্রিয়াংকা শঙ্কিত গলায় বলল, কী দেখে?

'দুইটা মানুষ না-কি দেখে। একটা আসল একটা নকল। কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল বুঝতে পারে না।'

'তুমি কী বলছ তাও তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'পাগল মাইনষের কথার কি ঠিক আছে আফা? নেন চা নেন।'

প্রিয়াংকা মাথা নিচু করে চায়ের কাপে ছোট-ছোট চুমুক দিচ্ছে। একবারও মরিয়মের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। তার ধারণা, তাকালেই মরিয়ম অনেক কিছু বুঝে ফেলবে। বুঝে ফেলবে যে প্রিয়াংকারও একই অসুখ হয়েছে। সে চায় না মরিয়ম কিছু বুঝুক। কারণ তার কিছুই হয় নি। অসুখ করেছে। অসুখ কি মানুষের করে না? করে। আবার সেরেও যায়। তারটা সারবে।

রাত গভীর হচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টুপটুপ করে। খোলা জানালায় হাওয়া আসছে। প্রিয়াংকা জাভেদকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। তার চোখে ঘুম নেই।

পাশের ঘরে বইয়ের পাতা ওল্টানোর শব্দ হচ্ছে। এই যে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। ইজিচেয়ার থেকে উঠল—ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে ইজিচেয়ারে।

প্রিয়াংকা স্বামীকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় ডাকল—এই-এই।

ঘুম ভেঙে জাভেদ বলল, কী?

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, না কিছু না। তুমি ঘুমাও।

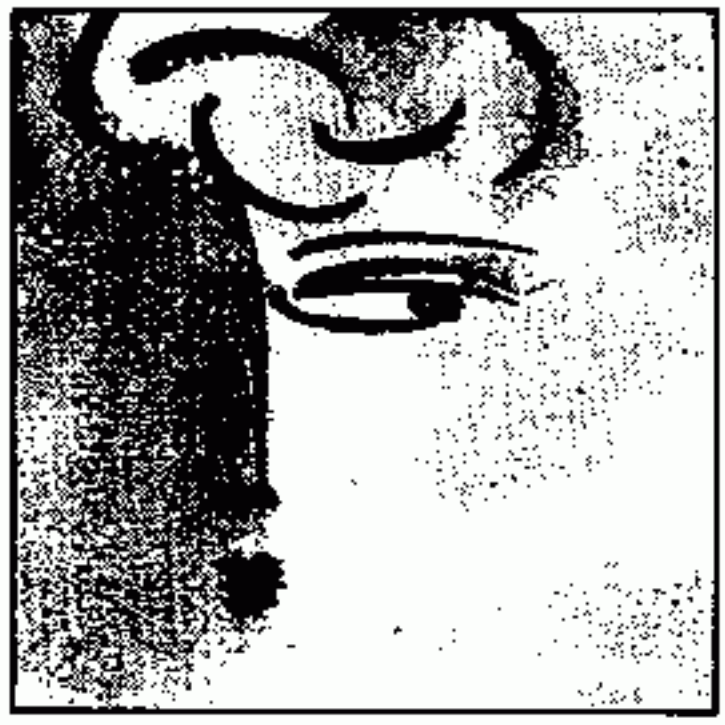

একজন ক্রীতদাস

কথা ছিল পারুল ন'টার মধ্যে আসবে।

কিন্তু এল না। বারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম একা একা। চোখে জল আসবার মতো কষ্ট হতে লাগল আমার। মেয়েগুলি বড্ড খেয়ালি হয়।

বাসায় এসে দেখি ছোট্ট চিরকুট লিখে ফেলে গেছে। "সন্ধ্যায় ৬৯৭৬২১ নম্বরে ফোন করো—পারুল।" তাদের পাশের বাড়ির ফোন। আগেও অনেকবার ব্যবহার করেছি। কিন্তু আজ তাকে ফোনে ডাকতে হবে কেন? অনেক আলাপ-আলোচনা করেই কি ঠিক করা হয় নি— আজ সোমবার বেলা দশটায় দুজন টাঙ্গাইল চলে যাব। সেখানে হারুনের বাসায় আমাদের বিয়ে হবে।

সারা দুপুর শুয়ে রইলাম। হোটেল থেকে ভাত এনেছিল। সেগুলি স্পর্শও করলাম না। ছোটবেলায় যেরকম রাগ করে ভাত না-খেয়ে থেকেছি আজও যেন রাগ করবার মতো সেরকম একটি ছেলেমানুষি ব্যাপার হয়েছে। 'পারুলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়েছে'— এই ভাবতে-ভাবতে নিজেকে খুব তুচ্ছ ও সামান্য মনে হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা টেলিফোন করবার জন্যে যখন বেরিয়েছি তখন অভিমানে আমার ঠোঁট ফুলে রয়েছে। গ্রিন ফার্মেসির মালিক আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বললেন, অসুখ নাকি ভাই?

আমি শুকনো গলায় বললাম, একটা টেলিফোন করব।

পারুল আশেপাশেই ছিল। রিনরিনে ছয়-সাত বছর বয়েসের ছেলেদের মতো গলা যা শুনলে বুকের মধ্যে সুখের মতো ব্যথা বোধ হয়।

হ্যালো শোন, কিন্ডারগার্টেনের মাস্টারিটা পেয়েছি। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? বড্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে লাইনে।

পারুলের উৎফুল্ল সতেজ গলা শুনে আমি ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। তোতলাতে তোতলাতে কোনোরকমে বললাম, আজ ন'টার সময় তোমার আসবার কথা ছিল...।

মনে আছে, মনে আছে। শোন তারিখটা একটু পিছিয়ে দাও। এখন তো আর সে রকম ইমার্জেন্সি নেই। তা ছাড়া...।

তা ছাড়া কী?

তোমার ব্যবসার এখন যা অবস্থা বিয়ে করলে দুজনকেই একবেলা খেয়ে থাকতে হবে।

হড়বড় করে আরো কী কী যেন সে বলল। হাসির শব্দও শুনলাম একবার। আমি বুঝতে পারলাম পারুল আর কখনোই আমাকে বিয়ে করতে আসবে না। কাল তাকে নিয়ে ঘর সাজাবার জিনিসপত্র কিনেছি। সারা নিউমার্কেট ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে কেনাকাটা করেছে। দোকানিকে ডবল বেডশিট দেখাতে বলে সে লজ্জায় মুখ লাল করেছে। এবং আজ সন্ধ্যাতেই খুব সহজ সুরে বলছে, 'তোমার ব্যবসার এখন যা অবস্থা'। আঘাতটি আমার জন্যে খুব তীব্র ছিল। আমার সাহস কম, নয়তো সে রাতেই আমি বিষ খেয়ে ফেলতাম কিংবা তিনতলা থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়তাম। আমি বড় অভিমানী হয়ে জন্মেছি।

সে বৎসর আরো অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটল। ইরফানের কাছে আমার চার হাজার টাকা জমা ছিল। সে হঠাৎ মারা গেল। রামগঞ্জে এক ওয়াগন লবণ বুক করেছিলাম। সেই ওয়াগনটি একেবারে উধাও হয়ে গেল। পাথরকুঁচি সাপ্লাইয়ের কাজটায় বড় রকমের লোকসান দিলাম। ভদ্রভাবে থাকবার মতো পয়সাতেও শেষপর্যন্ত টান পড়ল। মেয়েরা বেশ ভালো আন্দাজ করে। পারুল সত্যি-সত্যি আমার ভবিষ্যৎটা দেখে ফেলেছিল। পারুলের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল। আমি নিজে কখনো যেতাম না তার কাছে। তবু তার সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়ে যেত। হয়তো বাসস্টপে দুজন একসঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছি। পারুল আমাকে দেখামাত্রই আন্তরিক সুরে বলেছে, কী আশ্চর্য, তুমি! একী স্বাস্থ্য হয়েছে তোমার? ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?

চলছে ভালোই।

ইশ বড় রোগা হয়ে গেছ তুমি। চা খাবে এক কাপ? এস তোমাকে চা খাওয়াব।

দুপুরবেলা সিনেমা হলের সামনে একদিন দেখা হয় গেল। আমি তাকে দেখতে পাই নি এরকম একটা ভান করে রাস্তায় নেমে পড়লাম। কিন্তু সে পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, এই এই। সিনেমা দেখতে এসেছিলে নাকি?

না।

শোন, একটা কথা শুনে যাও।

কী?

আমার এক বান্ধবীর ছেলের আজ জন্মদিন। প্লিজ একটা উপহার আমাকে চয়েস করে দাও। চল আমার সাথে।

পারুলকে যতবার দেখি ততবারই অবাক লাগে। তিনশ টাকার স্কুল মাস্টারি তাকে কেমন করে এতটা আত্মবিশ্বাসী আর অহংকারী করে তুলেছে, ভেবে পাই না। ভুলেও সে আমাদের প্রসঙ্গ তুলে না। এক সোমবারে আমরা যে একটি বিয়ের দিন ঠিক করেছিলাম তা যেন বান্ধবীর ছেলের জন্মদিনের চেয়েও অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। তার উজ্জ্বল চোখ, দ্রুত কথাবলার ভঙ্গি স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় জীবন অনেক অর্থবহ ও সুরভিত হয়ে হাত বাড়িয়েছে তার দিকে।

এপ্রিল মাসের তেরো তারিখে পারুলের বিয়ে হয়ে গেল। নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়ে সে যে আমাকে তার একটি নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখায় নি সেইজন্যে আমি তাকে প্রায় ক্ষমা করে ফেললাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমি একটি ভালো রেস্টুরেন্টে খেয়ে অনেকদিন পর সিনেমা দেখতে গেলাম। সিনেমার শেষে বন্ধুর বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত হৃষ্টমনে গল্প করতে লাগলাম। এমন একটা ভাব করতে লাগলাম যেন পারুলের বিয়েতে আমার বিশেষ কিছুই যায় আসে না। একজনের সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে অন্য একজনকে বিয়ে করা যেন খুব একটা সাধারণ ব্যাপার—অহরহই হচ্ছে।

সে রাতে ঘরের বাতাস আমার কাছে উষ্ণ ও আর্দ্র মনে হতে লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। শুয়ে-শুয়ে ক্রমাগত ভাবলাম ব্যবসার অবস্থাটা অল্প একটু ভালো হলেই একটি সরল দুঃখী-দুঃখী চেহারার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলব। এবং সেই মেয়েটির সঙ্গে পারুলের হৃদয়হীনতার গল্প করতে-করতে হা-হা করে হাসব।

কিন্তু দিনদিন আমার অবস্থা আরো খারাপ হল। একটা ছোটখাটো কনট্রাক্ট নিয়েছিলাম। তাতে সঞ্চিত টাকার সবটাই নষ্ট হয়ে গেল। একেবারে ডুবে যাবার মতো অবস্থা। চাকর ছেলেটিকে ছাড়িয়ে দিতে হল। দু-একটি শৌখিন জিনিসপত্র (একটি থ্রি ব্যান্ড ফিলিপস্ ট্রানজিস্টার, একটি ন্যাশনাল রেকর্ড প্লেয়ার, একটি দামি টেবিল ঘড়ি) যা বহু কষ্ট করে কৃপণের মতো পয়সা জমিয়ে-জমিয়ে কিনেছি, বিক্রি করে দিলাম। এবং তারপরও আমাকে একদিন শুধু হাফ-পাউন্ডের একটি পাউরুটি খেয়ে থাকতে হল।

সহায়-সম্বলহীন একটি ছেলের কাছে এ শহর যে কী পরিমাণ হৃদয়হীন হতে

পারে তা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। নিষ্ঠুর এবং অকরুণ এই শহরে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সে সময় সারাক্ষণই খিদের কষ্ট লেগে থাকত। ফুটপাতের পাশে চটের পর্দার আড়ালে ভাতের দোকানগুলি দেখলেই মন খারাপ হয়ে যেত। দেখতাম রিকশাঅলা শ্রেণীর লোকরা উবু হয়ে বসে গ্রাস পাকিয়ে মহানন্দে ভাত খাচ্ছে। চুম্বকের মতো সেই দৃশ্য আমাকে আকর্ষণ করত। 'আহ ওরা কী সুখেই না আছে!'—এইরকম মনে করে আমার চোখ ভিজে উঠত। আমি বেঁচে থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। 'নিউ ইংক' কালি কোম্পানির সেলসম্যানের চাকরি নিলাম একবার। একবার কাপড়কাচা সাবানের বিজ্ঞাপন লেখার কাজ নিলাম। পারুলকে আমার মনেই রইল না। বেমালুম ভুলে গেলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মোহাম্মদপুর বাজারের কাছ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি পারুল। সঙ্গে ফুটফুটে একটি বাচ্চা। পায়ে লাল জুতো, মুখটি ডল-পুতুলের মতো গোলগাল। পারুলের শাড়ির আঁচল ধরে টুকটুক করে হাঁটছে। পারুল যাতে আমাকে দেখতে না পায় সেইজন্যেই আমি সুট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম। অথচ তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। পারুলের সমস্ত ইন্দ্রিয় তার মেয়েটিতে নিবদ্ধ ছিল। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল এই চমৎকার ডল-পুতুলের মতো মেয়েটি আমার হতে পারত। কিন্তু পরক্ষণেই সোবহান মিয়া হয়তো আমাকে কাজটা দেবে না— এই ভাবনা আমাকে অস্থির করে ফেলল।

আমার ভাগ্য ভালো। কাজটা হয়ে গেল। রোজ সকালে সেগুনবাগিচা থেকে হেঁটে হেঁটে মোহাম্মদপুরে আসি। সমস্ত দিন সোবহান মিয়ার ইন্ডেন্টিং ফার্মের হিসাব-নিকাশ দেখে অনেক রাতে সেগুনবাগিচায় ফিরে যাই। নিরানন্দ একঘেয়ে ব্যবস্থা। গভীর রাতে মাঝে-মধ্যে ঘুম ভেঙে গেলে মরে যেতে ইচ্ছে করে। রাস্তায় আমি মাথা নিচু করে হাঁটি। পরিচিত কেউ আমাকে উচ্চস্বরে ডেকে উঠুক তা এখন আর চাই না। কিন্তু তবু পারুলের সঙ্গে আরো দুবার আমার দেখা হয়ে গেল। একবার দেখলাম হুড-ফেলা রিকশায় সে বসে, চোখে বাহারি সানগ্লাস। তারপাশে চমৎকার চেহারার একটি ছেলে (খুব সম্ভব এই ছেলেটিকেই সে বিয়ে করেছে কারণ সফিকের কাছে শুনেছি পারুলের বর হ্যান্ডসাম এবং বেশ ভালো চাকরি করে)। দ্বিতীয়বার দেখলাম অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে হাসতে-হাসতে যাচ্ছে। কোনোবারই সে আমাকে দেখতে পায় নি। অবিশ্যি দেখতে পেলেও সে আমাকে চিনতে পারত না। অভাব, অনাহার ও দুর্ভাবনা আমার চেহারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। তাছাড়া পুরনো বন্ধুদের করুণা ও কৌতূহল থেকে বাঁচবার জন্যে আমি দাড়ি রেখেছিলাম। লম্বা দাড়ি ও ভাঙা চোয়ালই আমার পরিচয়কে গোপন

রাখবার জন্যে যথেষ্ট ছিল। তবু আমি হাত দুলিয়ে অন্যরকম ভঙ্গিতে হাঁটা অভ্যাস করলাম। যার জন্যে সফিক (যার সঙ্গে এক বিছানায় অনেকদিন ঘুমিয়েছি) পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারে নি। চেহারা পরিচিত মনে হলে মানুষ যেরকম পিটপিট করে দুএকবার তাকায় তাও সে তাকায় নি।

আমি নিশ্চিত, পারুলের সঙ্গে কোনো একদিন চোখাচোখি হবে। এবং সেও চিনতে না পেরে সফিকের মতো ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে যাবে। কিন্তু পারুল আমাকে এক পলকে চিনে ফেলল। আমাকে দেখে সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু এক মুহূর্ত সে কোনো কথা বলতে পারল না। আমি খুব স্বাভাবিক গলায় বললাম— ভালো আছ পারুল? অনেকদিন পরে দেখা। আমার খুব একটা জরুরি কাজ আছে। যাই তাহলে কেমন?

পারুল আশ্চর্য ও দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি তখন সে কথা বলল, তোমার এমন অবস্থা হয়েছে?

আমি অল্প হাসির ভঙ্গি করে হালকা সুরে বলতে চেষ্টা করলাম, ব্যবসাটা ফেল মেরেছে পারুল। আচ্ছা যাই তাহলে?

পারুল সে কথার জবাব দিল না। আমি বিস্মিত হয়ে দেখি তার চোখে পানি এসে পড়েছে। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল।

পারুলকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যে জীবন আমার শুরু হয়েছে সেখানে প্রেম নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সামান্য কয়েক ফোঁটা মূল্যহীন চোখের জলের মধ্যে পারুল নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করল। সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে তাকে হারানোর দুঃখই নতুন করে অনুভব করলাম।

আমার জন্যে এই দুঃখটার বড় বেশি প্রয়োজন ছিল।

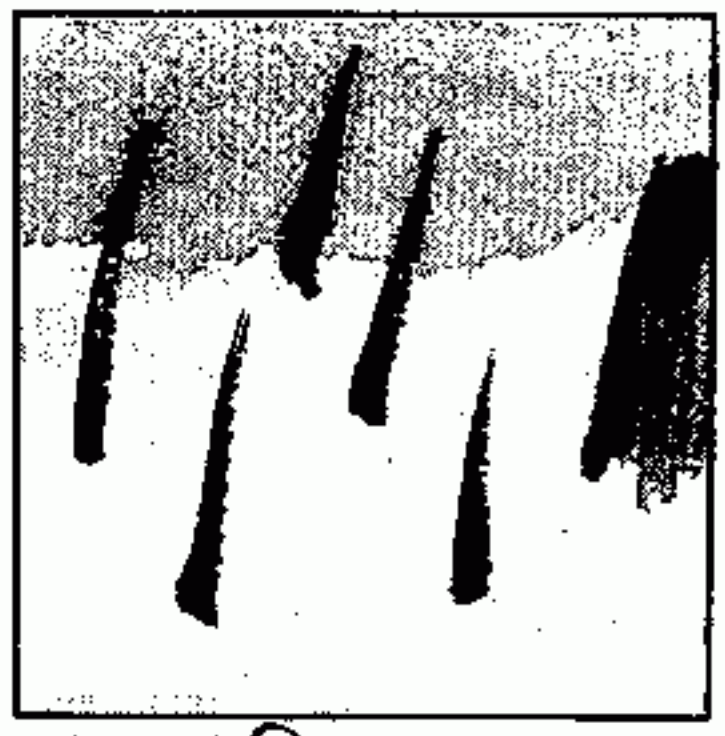

শাদা গাড়ি

আমি যাদের পছন্দ করি না তাদের সঙ্গেই আমার ঘুরেফিরে দেখা হয়। হয়তো খুব জমিয়ে গল্প করছি— কাজের ছেলেটি এসে বলল, 'কে জানি আইছে, আপনারে বুলায়।' বাইরে উঁকি দিলে এমন একজনকে দেখা যাবে যার সঙ্গে একসময় খাতির ছিল। এখন নেই। তবু হাসির একটা ভাব করে উল্লাসের সঙ্গে বলতে হবে, আরে-আরে কী খবর? তারপর কেমন চলছে? একসময় হয়তো এই লোকটির সঙ্গে তুই-তোকারি করতাম। এখন দূরত্ব রাখার জন্যে ভাববাচ্যে কথা বলতে হয়। বাংলাভাষার ভাববাচ্য খুব উন্নত নয়। দীর্ঘসময় কথা চালানো যায় না।

আজকের ব্যাপারটাই ধরা যাক। আড্ডা জমে উঠেছে। বাংলা বানান নিয়ে খুব তর্ক বেধে গেছে। এমন সময় কাজের ছেলেটি এসে বলল আমাকে কে নাকি ডাকছে। বেরিয়ে দেখি সাব্বির। আমি হাসিমুখেই বললাম— বাইরে কেন, ভেতরে এসে বসুন। সে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।

আসুন ভেতরে।

না, না ঠিক আছে।

আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছে। গল্পগুজব হচ্ছে। আসুন পরিচয় করিয়ে দেই।

অন্য আরেকদিন আসব।

আজ অসুবিধা কিসের? আসুন ভেতরে।

সাব্বির চোখ-মুখ লাল করে ভেতরে ঢুকল। পুরুষমানুষদের লজ্জায় এমন লাল হতে কখনো দেখি নি। নাকের পাতায় বিন্দুবিন্দু ঘাম।

ভেতরে তখন তুমুল উত্তেজনা। আজিজ ফজলুকে জিজ্ঞেস করছে, 'ধূলি বানান কর দেখি? হ্রস্বউকার না দীর্ঘউকার?' রাগের চোটে ফজলু তোতলাচ্ছে। ক্রমাগত তার মুখ দিয়ে থুতু পড়ছে। বিশ্রী অবস্থা।

সাব্বির নার্ভাস ভঙ্গিতে রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছল এবং মৃদুস্বরে বলল, 'আজ যাই, অন্য আরেক দিন আসব।'

বসুন না। তাস হবে। তাস খেলতে পারেন তো?

জি-না। আজ আমি যাই। আজ আমার একটা কাজ আছে।

আমি সাব্বিরকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। সেখানে শাদা রঙের প্রকাণ্ড একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুশকো জোয়ান এক ড্রাইভার সাব্বিরকে দেখে স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে বের হল এবং দ্রুত দরজা খুলে মূর্তির মতো হয়ে গেল। আমাদের বয়সী একটা ছেলের জন্যে এতটা আয়োজন আছে ভাবাই যায় না। আমি তীব্র একটা ঈর্ষা নিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। ছুটির সকালে ঈর্ষার মতো জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু এটা অনেকক্ষণ ধরে বুকে খচখচ করতে লাগল।

সাব্বিরের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটা এরকম— পুরানা পল্টনের এক ওষুধের দোকানে ঢুকেছি প্যারাসিটামল কিনতে। পয়সা দিয়ে বেরুবার সময় দেখলাম ঘটাঘট শব্দে সব দোকানের ঝাপ পড়ে যাচ্ছে। চারদিকে দারুণ ব্যস্ততা। কী হয়েছে কেউ কিছু বলতে পারছে না। সবাই ছুটছে। ট্রাকঅলাদের সঙ্গে বাসঅলাদের কী নাকি একটা ঝামেলা। একদল লোক নাকি রামদা নিয়ে বের হয়েছে। ব্যাপারটা গুজব হবারই কথা। এ যুগে রামদা নিয়ে কেউ বের হয় না। তবে সাবধানের মার নেই। দ্রুত পাশের গলিতে ঢুকে দেখি গলির মাথায় একটা পাঞ্জাবি গায়ে দারুণ ফরসা ছেলে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তবে চশমা ছিটকে পড়েছে অনেকটা দূরে। আমি গিয়ে তাকে টেনে তুললাম। সে বিড়বিড় করে বলল, 'চশমা ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাই না। আমার মায়োপিয়া, চোখের পাওয়ার সিক্স ডাইওপটার।' চশমার একটা কাচ খুলে পড়ে গিয়েছিল। এক কাচের চশমা পরে সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাকে বাড়ি না-পৌঁছানো পর্যন্ত সে আমার বাঁ হাত শক্ত করে ধরে রাখল। সম্ভবত ভয় পাচ্ছিল, আমি তাকে ফেলে রেখে চলে যাব।

কোনো পুরুষমানুষের এমন মেয়েদের মতো চেহারা হয় আমার জানা ছিল না। পাতলা ঠোঁট। কাচবিহীন চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কাজল পরানো। কিশোরীদের মতো ছোট্ট চিবুক। আমি বললাম, আপনি কী করেন?

ইংরেজিতে এম.এ. পরীক্ষা দেব।

তাই নাকি? ভালো।

গত বৎসর পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। দেই নি। আমার হার্টের অসুখ, হার্টবিটের রিদমে গণ্ডগোল আছে।

চিকিৎসা করছেন তো?

এর কোনো চিকিৎসা নেই।

এই বলেই সে ফ্যাকাশে ভাবে হাসতে লাগল। আমি সিগারেট বের করলাম, নেন, সিগারেট নেন।

আমি সিগারেট খাই না। নিকোটিন হার্টের মাসলে ক্ষতি করে। ফাইবার গুলি শক্ত করে দেয়।

এতসব জানলেন কীভাবে?

আমার মা ডাক্তার।

নিউ ইস্কাটনের যে বাড়ির সামনে রিকশা থামল সেটাকে বাড়ি বলা ঠিক না। সেটা একটা হুলস্থূল ব্যাপার। আমরা রিকশা থেকে নামতেই চারদিকে ছোটাছুটি পড়ে গেল। সাব্বিরের মতো দেখতে একজন মহিলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলতে লাগলেন, কেন তুমি কাউকে কিছু না বলে বেরুলে? আর বেরুলেই যখন কেন গাড়ি নিলে না?

সাব্বির অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। ভদ্রমহিলা অভিমানী স্বরে বললেন, কেন তুমি আমাদের কষ্ট দাও?

আর যাব না মা।

তোমার দুর্বল হার্ট। যে-কোনো সময় কিছু-একটা যদি হয়ে যেত। তখন?

মা আর যাব না।

এ ছেলেটাই সাব্বির।

রাত ৮ টার আগে আমি এদের বাড়ি থেকে বেরুতে পারলাম না। সাব্বিরের বাবা এবং মা এমন একটা ভাব করতে লাগলেন যেন আমি সাব্বিরকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। এরকম বড় একটা কাজের যোগ্য পুরস্কার দিতে না পেরে তারা দুজনেই অস্থির।

আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এবং বাড়ি চিনে আসবার জন্যে একজন লোক চলল আমার সঙ্গে। ছোট গলিতে বড় গাড়ি ঢুকবে না— এইজন্য টেলিফোন করে একটা ছোট গাড়ি আনানো হল।

সাব্বির মা-বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমাকে এগিয়ে দিতে এল গেট পর্যন্ত। নিচু স্বরে বলল, বাবা-মা আমার জন্যে খুব ব্যস্ত। একটামাত্র ছেলে তো।

আপনি একাই নাকি?

জি। পাঁচ ভাইবোন ছিলাম আমরা। এখন আমি একা আছি।

বাকিরা কোথায়?

সবাই মারা গেছে। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ বেশিদিন বাঁচে না। আমার এক চাচা ছিলেন। তাঁরও চার ছেলেমেয়ে ছিল। সবাই ত্রিশ হবার আগেই মারা গেছে।

বলেন কী!

জি। আমিও বাঁচব না।

আরে, এসব কী বলছেন?

জি, সত্যি কথাই বলছি। দেখেন না হার্টের অসুখ হয়ে গেল।

আমার বন্ধুবান্ধবরা সব আমার মতো। পাস করবার পর সবাই কিছু-একটাতে ঢুকে পড়েছে। ব্যাংক, ট্রাভেল এজেন্সি, নাইট কলেজের পার্ট টাইম টিচার। একমাত্র আজিজ কোথাও কিছু না পেয়ে ল'তে ভর্তি হয়েছে। ছুটিছাটার দিনে তাসটাস খেলি। মাঝে-মধ্যে পরিমলদের মামার বাড়িতে ভিসিআর দেখি এবং প্রায় সবদিনই আড্ডাটা শেষ হয় একটা ঝগড়ার মধ্যে। কোনো কোনো সময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। তাতে অসুবিধা হয় না কিছু। আবার যখন দেখা হয় পুরনো কথা আর মনে থাকে না। বিয়ে করার আগপর্যন্ত এই সময়টা বেশ ভালো। চায়ের দোকানে বসে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দেয়ামাত্র মনে হয় জীবনটা বড়ই সুখের। ফজলুদের ভাড়াটেদের ছোটমেয়ের হৃদয়হীনতা আমাদের ফজলুর চেয়েও বেশি আহত করে।

এরকম সুখের সময় উপদ্রবের মতো মাঝে-মাঝে উপস্থিত হয় সাব্বির। তাদের গাড়ির মুশকো ড্রাইভার চায়ের দোকান থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। সাব্বির লজ্জায় লাল হয়ে বলে, চা খাচ্ছিলেন সবাই মিলে?

হুঁ আড্ডা দিচ্ছি, আসুন না।

জি-না, আমি চা খাই না।

চা না-খেলে না খাবেন, বসে গল্প করুন।

আরেকদিন আসব। আজ একটু কাজ আছে।

কাজ থাকলে চলে গেলেই হয়। তা না। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। বিরক্তিতে আমার গা জ্বলে যায়, তবু ভদ্রতা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

কী নিয়ে এত গল্প করেন?

গল্প করার টপিকের অভাব আছে নাকি? রাজনীতি, মেয়েমানুষ, সিনেমা, প্রেম। এসে শুনুন না। শুনতে না চাইলে বলুন।

কী বলব?

প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন।

সাব্বির টমেটোর মতো লাল হয়ে বলল, মেয়েদের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে সামনাসামনি বসে কথা বলি নি।

বলেন কী!

জি সত্যি। আমি একাই থাকি। মেয়েদের সঙ্গে মেশা আমার মা পছন্দ করেন না। আমার হার্টে অসুখ।

তাতে কী?

মানে ইয়ে— সামান্যতম একসাইটমেন্টে রিদমে গণ্ডগোল হয়। মেজর প্রবলেম হতে পারে।

আমি ঝামেলামুক্ত হবার জন্য বলি, আজ তাহলে যান। রোদ লাগছে। সাব্বির তবু যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। তার একটু দূরে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুশকো ড্রাইভার। কুৎসিত ব্যাপার।

মেয়েলি চেহারার এই যুবকের সুখ-দুঃখের সাথে আমার সুখ-দুঃখের কোনো মিল নেই। এর সঙ্গে নরম স্বরে মিষ্টি কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। আমি সাব্বিরকে এড়িয়ে চলবার জন্য নানারকম কৌশল করি। ঘরে বসে থেকে কাজের ছেলেটিকে বলে পাঠাই— বাসায় নেই। কখন ফিরবে তারো ঠিক নেই। কোনো কোনো দিন নিজেই গিয়ে বলি, আমি এক্ষুনি বেরুব। হাসপাতালে এক বন্ধুকে দেখতে যাবার কথা। আজ তো কথা বলতে পারছি না।

আসুন, হাসপাতালে পৌঁছে দেই। কোন্ হাসপাতাল?

না না, তার কোনো দরকার নেই।

আমার কোনো অসুবিধা হবে না, আসুন না।

মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। রাস্তায় কোনো শাদা রঙের গাড়ি দেখলেই মনে হয়— এই বুঝি গাড়ি থামিয়ে ফরসা পাঞ্জাবি-পরা সাব্বির বেরিয়ে আসবে। মোটা কাচের আড়ালে যার চোখ ঢাকা বলে মনের ভাব বোঝা যাবে না। কথা বলবে এমন ভালোমানুষের মতো যে রাগ করা যাবে না আবার সহ্যও করা যাবে না।

রাস্তায় বেরুলেই একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি লেগে থাকে। এই বুঝি দেখা হল। অস্বস্তিটা সবচে বেশি হয় নীলু সঙ্গে থাকলে। নীলু তার কারণ বুঝতে পারে না। সে বিরক্ত হয়ে বলে, এরকম কর কেন? দেখা হলে কী হবে? আমার তো ভদ্রলোককে দেখতেই ইচ্ছা করছে।

একদিন অবিশ্যি দেখা হলো। গ্রিন রোড দিয়ে হেঁটে-হেঁটে আসছি। হঠাৎ

রাস্তার পাশে শাদা গাড়িটি দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ির ভিতর থেকে সাব্বির অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমি না-দেখার ভান করলাম। এবং অতি দ্রুত একটা রিকশা ঠিক করে নীলুকে নিয়ে উঠে পড়লাম। সারাক্ষণই ভয় করতে লাগল এক্ষুনি হয়তো সে গাড়ি নিয়ে সামনে এসে থামবে। লাজুক গলায় বলবে— কোথায় যাবেন বলুন, নামিয়ে দি। সেরকম কিছু ঘটল না। নীলু বিরক্ত হয়ে বলল, হুট করে রিকশা নিলে কেন? আমি কতবার বলেছি পাশাপাশি রিকশায় চড়তে আমার ভালো লাগে না।

ভালো লাগে না কেন?

হুড তুলতে হয়। হুড তুললেই আমার কেন জানি দম বন্ধ হয়ে আসে।

হুড না তুললেই হয়।

পাগল, হুড না তুলে অবিবাহিত একটা ছেলের সঙ্গে আমি রিকশায় চড়ব!

বিকালটা আমার চমৎকার কাটল। দুজনে খুব ঘুরলাম। সন্ধ্যাবেলা ঢুকে পড়লাম একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। নীলু সারাক্ষণই বলল— ইশ, বাসার সবাই দুশ্চিন্তা করছে। তবু উঠবার কোনো তাড়া দেখাল না।

নীলুকে শ্যামলীতে রেখে বাসায় ফিরে দেখি সাব্বির আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী ব্যাপার?

কোনো ব্যাপার নয়, এমনি এলাম। দিনে এলে তো আপনাকে পাওয়া যায় না।

কোনো বিশেষ কাজে এসেছেন, না শুধু গল্প করবার জন্য?

না কোনো কাজে না, এমনি। সাব্বির রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। আমি বললাম, চা খান। চা দিতে বলি?

জি না, চা-টা না। আমি এখন যাব। মা চিন্তা করছেন, এত রাত পর্যন্ত বাইরে কখনো থাকি না।

আজই বা থাকলেন কেন?

আপনাদের দুজনকে আজ দেখলাম। বড় ভালো লাগল। সেইটা বলবার জন্যে।

সাব্বির লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল।

আমাকে আর নীলুকে দেখেছেন বুঝি?

জি। বড় ভালো লাগল। আমি একবার ভাবলাম এগিয়ে গিয়ে বলি— কোথায় যাবেন চলুন পৌঁছে দেই। আপনারা কী মনে করেন এই ভেবে গেলাম না।

আমি নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধরালাম। সাব্বির মৃদুস্বরে বলল, আমি অবিশ্যি আপনাদের পেছনে-পেছনে গিয়েছি।

তাই নাকি?

জি, ড্রাইভারকে বললাম দূর থেকে ঐ রিকশাটাকে ফলো করো।

তারপর ফলো করলেন?

জি। শাহাবাগ পর্যন্ত। তারপর ড্রাইভার আর রিকশাটা লোকেট করতে পারল না। আপনি কি রাগ করছেন?

না।

আমি একবার ভেবেছিলাম আপনাকে বলব না। কিন্তু আপনাদের দুজনকে এত সুন্দর লাগছিল। কী সুখী-সুখী লাগছিল। আমার মনে হল এটা বলা উচিত। আপনি রাগ করেন নি তো?

আমি ঠাণ্ডা স্বরে বললাম, না রাগ করি নি। রাত অনেক হয়ে গেছে এখন বাসায় যান। নয়তো আপনার মা আবার রাগ করবেন।

জি তা ঠিক।

সাব্বির চলে গেল কিন্তু আমার বিরক্তির সীমা রইল না। লোকটি কী নির্বোধ না অন্যকিছু? আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ হল। এরকম ঘটনা আবার ঘটবে, ও যদি আমাকে এবং নীলুকে আবার কখনো দেখে তাহলে আবারো তার শাদা গাড়ি আসবে পেছনে পেছনে। কী অসহ্য অবস্থা।

ঘটলও তাই। দিন সাতেক পর সাব্বির এসে হাসিমুখে বলল, আপনারা কি বুধবার বিকালে শিশু পার্কের সামনে ফুচকা খাচ্ছিলেন?

মনে নেই।

আপনার পরনে ছিল একটা চেকচেক শার্ট আর আপনার বান্ধবীর গায়ে লাল রঙের চাদর। হাতে একটা চটের ব্যাগ, মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, পড়েছে।

আমি কিন্তু ফুচকা খাবার পর থেকে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় এক ঘণ্টা আপনাদের ফলো করেছি।

তাই নাকি?

জি।

এত ভালো লাগছিল আমার। ড্রাইভারকে বললাম তারা দেখতে পায় না এমনভাবে তাদের ফলো করো। আপনি অবিশ্যি একবার পেছনে তাকিয়েছেন। কিন্তু কিছু বুঝতে পারেন নি।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, নীলুর সঙ্গে থাকলে আমি একটু অন্যমনস্ক থাকি।

সাব্বির গভীর আগ্রহে বলল, আচ্ছা এলিফেন্ট রোডের ঐ দোকানটা থেকে কী কিনলেন আপনারা?

আমি তার জবাব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, আসুন, আপনার সঙ্গে নীলুর পরিচয় করিয়ে দেই।

না না, তার কোনো দরকার নেই। আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতেই আমার ভালো লাগে। কীরকম অদ্ভুত সুখী-সুখী চেহারা। জানেন আমি মা'কে আপনাদের কথা বলেছি?

ভালো করেছেন।

আমি যে মাঝে-মাঝে আপনাদের পেছনে-পেছনে যাই আপনি রাগ করেন না তো?

আমি উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরালাম। একটা শাদা গাড়ি সর্বত্র আমাদের অনুসরণ করছে এটা ভাবতেই মন শক্ত হয়ে যায়।

সাব্বির বসে আছে আমার সামনে। তার ফরসা কিশোরীদের মতো মুখে উত্তেজনার ছাপ। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। চোখ চক্‌চক্ করছে। বোধহয় কেঁদেই ফেলবে। সে অনেকখানি ঝুঁকে এসে বলল, পৃথিবীর মানুষ এত সুখী কেন বলুন তো?

সাব্বিরের সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। আর কখনো সে আমার কাছে আসে নি। হয়তো শরীর খুব বেশি খারাপ। ঘর থেকে বেরোতে পারছে না। কিংবা গিয়েছে বাইরে। কিংবা অন্যকিছু। গিয়ে খোঁজ নেবার মতো ইচ্ছা কখনো হয় নি।

সাব্বির আর কখনো আসে নি কিন্তু তার শাদা গাড়িটি ঠিকই অনুসরণ করেছে আমাদের। যখনই নীলু মজার একটা-কিছু বলছে কিংবা যখনই আমার নীলুর হাত ধরতে ইচ্ছা হয়েছে তখনই বুঝতে পেরেছি বিশাল শাদা গাড়িটা আশেপাশে কোথাও আছে। এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

নীলুর সঙ্গে শেষপর্যন্ত আমার বিয়ে হয় নি। যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছি সে নীলুর মতো নয়। কিন্তু তার জন্যেও আমি প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করি। বৃষ্টির রাতে যখন হঠাৎ বাতি চলে যায়, বাইরে হাওয়ার মাতামাতি শুরু হয় আমি গভীর আবেগে হাত রাখি তার গায়ে। তখনি মনে হয় কাছেই কোথাও শাদা গাড়িটি বৃষ্টিতে ভিজছে। চশমা-পরা অসুস্থ যুবক ভুরু কুঁচকে ভাবছে, মানুষ এত সুখী কেন?

বীণার অসুখ

বীণার বয়স একুশ।

সে লালমাটিয়া কলেজে বি.এ. সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। বীণার মামা ইদরিশ সাহেব একদিন হঠাৎ বললেন, বীণা তোর কলেজে যাবার দরকার নেই। বাসায় থেকে পড়াশোনা কর। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিলেই হবে। কলেজে আজকাল কী পড়াশোনা হয় তা তো জানাই আছে। যাওয়া-না-যাওয়া একই।

বীণা ঘাড় নেড়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, জি আচ্ছা।

মামার কথার উপর কথা বলার সাহস বীণার নেই। তার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ মামা দেন। গত বছর গলার একটা চেন বানিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া তার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে যদি ঠিকঠাক হয় সেই খরচও মামাকেই দিতে হবে। বীণার বাবা প্যারালাইসিস হয়ে দেশের বাড়িতে পড়ে আছেন। তাঁর পক্ষে একটা টাকাও খরচ করা সম্ভব না। তিনি সবার কাছ থেকে টাকা নেন। কাউকে কিছু দেন না।

ইদরিশ সাহেব বললেন, বীণা, তুই আমাকে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দে। আর শোন্, কলেজে না-যাওয়া নিয়ে মনটন খারাপ করিস না। মন খারাপের কিছু নাই।

'জি আচ্ছা মামা'।

বীণা শরবত আনতে চলে গেল। তার মনটা অসম্ভব খারাপ। কলেজ বন্ধ করে দেবার কোনো কারণ সে বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞেস করার সাহসও নেই। দিনের পর দিন ঘরে বসে থেকেই বা সে কী করবে? শরবত বানাতে-বানাতে তার মনে হল-হয়তো তার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। গফরগাঁয়ের ঐ ছেলে শেষ-পর্যন্ত

হয়তো রাজি হয়েছে। হয়তো ওরা বলেছে— মেয়েকে কলেজে পাঠাবেন না। বিয়ে ঠিকঠাক হলে ছেলেপক্ষের লোকজন অদ্ভুত অদ্ভুত শর্ত দিয়ে দেয়।

গফরগাঁয়ের ঐ ছেলেটাকে বীণার একেবারেই পছন্দ হয় নি। কেমন যেন পশু-পশু চেহারা। সোফায় বসেছিল। দুই হাঁটুতে দুহাত রেখে। মুখ একটু হাঁ হয়ে ছিল। সেই হাঁ-করা মুখের ভেতর কালো কুচকুচে জিহ্বা। বীণার দিকে এক পলক তাকাতেই বীণার বুক ধ্বক করে উঠল। মনে হল একটা পশু জিভ বের করে বসে আছে। তার নাকে ঝাঁঝাল গন্ধও এসে লাগল। গন্ধ ঐ লোকটার গা থেকে আসছিল। টক দুধ এবং পোড়া কাঠের গন্ধ একত্রে মেশালে যেরকম গন্ধ হয় সেরকম একটা গন্ধ। গা কেমন ঝিমঝিম করে।

লোকটা তাকে কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। বীণার একবার মনে হল, লোকটার চোখে হয়তো পাতা নেই। সাপের যেমন চোখের পাতা থাকে না সেরকম। লোকটার সঙ্গে বয়স্ক যে দুজন মানুষ এসেছিলেন তারা অনবরত কথা বলতে লাগলেন। একজন বীণাকে ডাকতে লাগলেন— আন্টি। চুল-দাড়ি পাকা বয়স্ক একজন লোক যদি আন্টি ডাকে তখন ভয়ংকর রাগ লাগে। কোনো কথারই জবাব দিতে ইচ্ছা করে না। বীণা অবিশ্যি সব প্রশ্নের জবাব দিল। কারণ, মামা তার পাশেই বসে আছেন। মামা বসেছেন সোফার ডানদিকে, সে বাঁদিকে। প্রশ্নের জবাব না-দেয়ার কোনো উপায়ই নেই।

'তারপর আন্টি' রবিঠাকুর কত সনে নোবেল পুরস্কার পান তা জানা আছে?'

'জি না।'

'উনিশশ তেরো। অবিশ্যি উনি উনিশশ তেরোতে না পেয়ে উনিশশ' একত্রিশে পেলেও কিছু যেত আসত না। তবু তারিখটা জানা দরকার। এটা হচ্ছে জেনারেল নলেজ। মেয়েরা শুধু রান্নাবান্না করবে তা তো না—তাদের পৃথিবীতে কী হচ্ছে না হচ্ছে তাও তো জানতে হবে। কী বলেন আন্টি?'

'জি।'

'আন্টি, আপনি খবরের কাগজ পড়েন?'

'না।'

'এইটা হচ্ছে মেয়েদের একটা কমন দোষ। কোনো মেয়ে খবরের কাগজ পড়েন না। আপনি কেন খবরের কাগজ পড়েন না, না-পড়ার কারণটা কী, আমাদের একটু বলুন তো আন্টি?'

বীণা কিছু বলল না। মামা পাশে বসে আছেন এই ভয়েই বলল না— কারণ মামা খবরের কাগজ রাখেন না বলেই খবরের কাগজ পড়ে না। এই তথ্যটা এঁদের জানানো নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। মামা রাগ করবেন।

ইদরিশ সাহেব বললেন, মা বীণা ইনাদের চা-মিষ্টি দাও।

চার-পাঁচ জাতের মিষ্টি টেবিলে সাজানো। বীণা প্লেটে উঠিয়ে উঠিয়ে সবার দিকে এগিয়ে দিল। লোকটাকে যখন দিতে গেল তখন লোকটা অদ্ভুত একধরনের শব্দ করল। থাবার মতো বিশাল হাত বাড়িয়ে মিষ্টির থালা নিল। বীণার গায়ে সত্যি-সত্যি কাঁটা দিয়ে উঠল। সে মনে-মনে বলল, আল্লা এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে। আল্লা এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে।

লোকটা বীণাকে পছন্দ করল কি করল না কিছুই বোঝা গেল না। ইদরিশ সাহেব এই প্রসঙ্গে বাসার কারো সঙ্গেই কোনো আলাপ করলেন না। ইদরিশ সাহেবের এই হল স্বভাব। বাসার কারোর সঙ্গেই কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবেন না। নিজে যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।

এই যে তিনি আজ বীণার কলেজে যাওয়া বন্ধ করলেন— এর কারণ তিনি কাউকে বলবেন না। ইদরিশ সাহেবের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে, নারীজাতির সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ না-করা। নারীজাতির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার ফল এটাই—সময় নষ্ট। কী দরকার সময় নষ্ট করে?

ইদরিশ সাহেবের বাসায় তিনি ছাড়া সবই মেয়ে। সব মিলিয়ে সাতজন মেয়ে। ইদরিশ সাহেবের স্ত্রী, চার কন্যা, তাঁর এক ছোট বোন এবং কাজের একটি মেয়ে। তাঁর বাসায় দুটো বিড়াল থাকে। এই বিড়াল দুটিও মেয়ে-বিড়াল। সঙ্গত কারণেই ইদরিশ সাহেব বাসায় যতক্ষণ থাকেন মনমরা হয়ে থাকেন। চারদিকে মেয়েজাতি নিয়ে বাস করতে তাঁর ভালো লাগে না। তিনি তাঁর ব্যবসা, তাঁর পরিকল্পনা কিছুই কাউকে বলেন না।

দিন পনেরো বীণার খুব ভয়ে-ভয়ে কাটল। কে জানে হয়তো লোকটা তাকে পছন্দ করে ফেলেছে। তার চেহারা এমন কিছু খারাপ না, পছন্দ করতেও পারে। রঙ মোটামুটি ফরসা। চোখদুটা মায়ামায়া, লম্বা হালকা-পাতলা শরীর। সাজলে তাকে ভালোই দেখায়। পছন্দ করে ফেললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বীণা বেশ কয়েকবার লজ্জায় মাথা খেয়ে তার মামিকে জিজ্ঞেস করেছে— মামি, মামা কী কিছু বলেছে?

বীণার মামি হাসিনা পৃথিবীর সরলতম মহিলা। অতি সহজ কথাও তিনি বুঝেন না। একটু ঘুরিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে এমনভাবে তাকান যে, মনে হয় অথই জলে পড়েছেন। বীণার সহজ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন— কিসের কথা রে?

'ঐ যে শুক্রবার যে আসল?'

'কে আসল শুক্রবার?'

'তিনজন লোক আসল না?'

'তিনজন লোক আবার কখন আসল?'

'বিয়ের আলাপ নিয়ে আসল না?'

'ও আচ্ছা—মনে পড়েছে। না, কিছু বলে নাই। তোর মামা কি কখনো কিছু বলে? হঠাৎ একদিন শুনবি বিয়ের দিন-তারিখ হয়ে গেছে। তোর মামা আগেভাগে কিছু বলবে? কোনোদিন না।'

মাসখানেক কেটে যাবার পরেও বীণার ভয় কাটল না। মামা তাকে কোনো কারণে ডাকলেই মনে হত এই বুঝি বলবেন— বীণা তোর বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেললাম। শ্রাবণ মাসের বার, মঙ্গলবার। তুই তোর বাবাকে চিঠি লিখে দে।

বীণা আতঙ্কে-আতঙ্কেই ভয়াবহ কিছু দুঃস্বপ্নও দেখল। এই দুঃস্বপ্নগুলির প্রতিটিতে তার বিয়ে হয় সুন্দর ছেলের সঙ্গে। বাসরঘরে সে আর ছেলেটা থাকে আর সবাই চলে যায়। লজ্জায় সে মাথা নিচু করে থাকে। তখন তার স্বামী আদুরে গলায় বলে— লজ্জায় দেখি মরে যাচ্ছ। এই, তাকাও না আমার দিকে। তাকাও। সে তাকায়। তাকাতেই তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। মানুষ কোথায়, একটা কুকুরের মতো পশু থাবা গেড়ে বসে আছে। হা-করা মুখের ভেতর কুচকুচে কালো একটা জিহ্বা। জিহ্বা মাঝে মাঝে মুখের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। পশুটার মুখ ছুঁচালো। তার গা থেকে টক দই আর পোড়া কাঠের গন্ধ ভেসে আসছে। স্বপ্নে মানুষ গন্ধ পায় না। কিন্তু বীণা এই জাতীয় স্বপ্নে গন্ধ পেত। তীব্র কটুগন্ধেই এক সময় ঘুম ভেঙে যেত।

প্রায় দেড়মাস এরকম আতঙ্কে কাটল। তারপর আতঙ্ক হঠাৎ করেই কেটে গেল। কারণ ইদরিশ সাহেব এক ছুটির দিনের দুপুরে ভাত খেতে-খেতে বললেন, বিয়েটা ভেঙে দিলাম।

হাসিনা বললেন, কার বিয়ে ভেঙে দিলে?

'বীণার, ঐ যে তিনজন এসেছিল শুক্রবার। খুব চাপাচাপি করছিল। মেয়ে নাকি তাদের খুব পছন্দ। ওদের বাড়ির অবস্থা ভালো। গফরগাঁয়ে কাপড়ের ব্যবসা আছে। গ্রামের বাড়িতে ধান-ভাঙা কল দিয়েছে। বড়-বড় আত্মীয়স্বজন।'

'তাহলে বিয়ে ভেঙে দিলে কেন?'

'ছেলের গায়ে বিশ্রী গন্ধ। ঘোড়ার আস্তাবলে গেলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায় সেই রকম। যে ক'বার এই ছেলে আমার কাছে এসেছে এরকম গন্ধ পেয়েছি। কী দরকার?'

হাসিনা দুঃখিত মুখ করে বললেন, আহা গন্ধের জন্যে বিয়েটা বাতিল করে দিলে। ভালোমতো সাবান দিয়ে গোসল দিলেই তো গন্ধ চলে যায়।

ইদরিশ সাহেব কড়া গলায় বললেন, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলবে না। তুমি রোজ গিয়ে গোসল করিয়ে আসবে নাকি? মেয়েছেলে মেয়েছেলের মতো থাকবে। সবকিছুর মধ্যে কথা বলবে না।

'রাগ করছ কেন? রাগ করার মতো কী বললাম?'

'চুপ। আর একটা কথাও না।'

ইদরিশ সাহেবের দুর্ব্যবহারে হাসিনা কাঁদতে বসেন। তবে বীণার আনন্দের সীমা থাকে না। যাক শেষপর্যন্ত লোকটির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না। মামার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বীণার মন ভরে যায়। মামা কথা না বললেও মানুষ খারাপ না। কে জানে এই যে তাকে কলেজে যেতে নিষেধ করেছেন এরও কোনো ভালো দিক নিশ্চয়ই আছে। মামা যদি শুধু কারণটা বলত। কিন্তু মামা বলবে না। অদ্ভুত মানুষ।

নিতান্তই আকস্মিকভাবে বীণা তার কলেজ বন্ধ হবার রহস্য জেনে ফেলল।

ইদরিশ সাহেব বীণার বাবাকে চিঠিতে কারণটা জানিয়েছেন। খামে ভরার আগে এই চিঠি বীণা পড়ে ফেলল।

পাকজনাবেষু

দুলাভাই,

আমার সালাম জানিবেন। পর সমাচার এই যে, বীণার কলেজে যাওয়া একটি বিশেষ কারণে বন্ধ করিতে হইয়াছে। বীণা ইহাতে কিঞ্চিৎ মনে কষ্ট পাইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য উপায় দেখিলাম না। এখন আপনাকে কারণ বলিতেছি।

জোবেদ আলী নামক গফরগাঁয়ের জনৈক যুবকের সহিত বীণার বিবাহের আলাপ হইয়াছিল। পাত্রপক্ষের, বিশেষ করিয়া পাত্রের, বীণাকে খুবই পছন্দ হইয়াছিল। একটি বিশেষ কারণে বিবাহের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতে হইয়াছে। এখন কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়াছে। উক্ত জোবেদ আলী প্রায়শই বীণাকে অনুসরণ করিয়া কলেজ পর্যন্ত যায়। ইহা আমার কাছে অত্যন্ত সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইল। আজকালকার ছেলেদের মতিগতির কোনো ঠিক নাই। একবার এ্যাসিড জাতীয় কিছু দেয় তাহা হইলে সর্বনাশের কোনো শেষ থাকিবে না। যাহা হউক আপনি তাহার বি.এ. পরীক্ষা নিয়া কোনো চিন্তা করিবেন না। আমি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সহিত আলাপ করিয়াছি। তিনিও বলিয়াছেন কোনো অসুবিধা হইবে না। আগেকার মতো কলেজগুলি পার্সেন্টেজ নিয়া ঝামেলা করে না। আপনার শরীরের হাল অবস্থা এখন কী? শরীরের যত্ন নিবেন। বীণাকে লইয়া অযথা চিন্তাগ্রস্ত হইবেন না।

চিঠি পড়ে বীণার গা কাঁপতে লাগল। কী সর্বনাশের কথা! ঐ লোক তার পেছনে পেছনে যায়। কই, সে তো একদিনও টের পায় নি। আর তার মামার কি উচিত ছিল না ঘটনাটা তাকে জানানো? সে এখন কলেজে যাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু

অন্য জায়গায় তো যাচ্ছে। আগে জানলে তাও যেত না। ঘরে বসে থাকত। অবশ্যই মামার উচিত ছিল ঘটনাটা তাকে জানানো।

বীণাকে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে বলা ঠিক হবে না। সে যদি বুদ্ধিমতী মেয়ে হত তাহলে চট করে বুঝে ফেলত তাকে ঘটনাটা জানানোর জন্যেই ইদরিশ সাহেব খামে ভরার আগে চিঠিটা দীর্ঘ সময় টেবিলে ফেলে রেখেছিলেন। এই জাতীয় ভুল তিনি কখনো করেন না।

বীণা বাড়ি থেকে বের হওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। আগের ভয়ের স্বপ্নগুলি আবার দেখতে লাগল। এবারের স্বপ্নে আরো সব কুৎসিত ব্যাপার ঘটতে লাগল। এমন হল যে, ঘুমুতে পর্যন্ত ভয় লাগে।

হাসিনা বলেন, কী হয়েছে তোর বল তো?

বীণা ফ্যাকাশে হাসি হেসে বলে, কই কিছু হয় নি তো?

'তুই তো শুকিয়ে চটি জুতা হয়ে যাচ্ছিস। তোর তো আর বিয়েই হবে না। এ রকম শুকনো মেয়েকে কে বিয়ে করবে বল? গায়ে গোশত না থাকলে ছেলেরা মেয়েদের পছন্দ করে না। ছেলেগুলি হচ্ছে বদের বদ। ঝাঁটা মারি এদের মুখে।'

বীণার বন্দিজীবন কাটতে লাগল। মেয়েরা যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে খুব সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বীণাও খাপ খাইয়ে নিল। সারাদিন তিন কামরার ঘরেই সময় কাটে। বাইরের বারান্দায় ভুলেও যায় না। বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তার অনেকটা চোখে পড়ে। তার ভয় বারান্দায় দাঁড়ালে যদি লোকটাকে দেখে ফেলে। এত সাবধানতার পরও একদিন দেখা হয়ে গেল। বারান্দায় কাপড় শুকোতে দেয়া হয়েছে। হাসিনা বললেন— বৃষ্টি এসেছে, কাপড়গুলি নিয়ে আয় তো বীণা। বীণা কাপড় আনতে গিয়ে পাথরের মতো জমে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তাটার অপর পাশে জারুল গাছের নিচে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে বীণার দিকে। মুখ হাঁ হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা কুঁজো হয়ে। বীণাকে দেখেই সে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে এপাশে চলে এল। হাত ইশারা করে কী যেন বলল। বীণা চিৎকার করে ঘরে ঢুকল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার জ্বর উঠে গেল একশ তিন।

হাসিনা বললেন, এটা কেমন কথা। লোকটা তো বাঘও না, ভালুকও না। তাকে দেখে এত ভয় পাওয়ার কী আছে?

বীণা বিড়বিড় করে বলল, আমি জানি না মামি। কেন এত ভয় লাগছে আমি জানি না। আপনি আমাকে ধরে বসে থাকেন। কেমন যেন লাগছে মামি।

ইদরিশ সাহেব সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে সব শুনলেন। কাউকে কিছুই বললেন

না। সহজ ভঙ্গিতে খাওয়াদাওয়া করলেন। বড় মেয়েকে অঙ্ক দেখিয়ে দিলেন। রাত সাড়ে ন'টার সময় বললেন, একটা স্যুটকেসে বীণার কাপড় গুছিয়ে দাও তো। রাত এগারোটায় বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস। বীণাকে দেশের বাড়িতে রেখে আসি।

হাসিনা হতভম্ব হয়ে বললেন, আজ রাতে?

ইদরিশ সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, আজ রাতে নয় তো কি পরশু রাতে না কি? জোবেদ হারামজাদা বড় বিরক্ত করছে। আমি আরো কয়েকদিন দেখেছি।

'আজ রাতে যাওয়ার দরকার কী, কাল যাও। 'বীণার জ্বর।'

'জ্বরের সঙ্গে কাপড় গোছানোর সম্পর্ক কী? কাপড় তো তুমি গোছাবে। তোমার গায়ে তো জ্বর নেই।'

হাসিনা কাপড় গুছিয়ে দিলেন। তার স্বামীকে তিনি চেনেন। কথাবার্তা বলে লাভ হবে না। বীণা একশ দুই পয়েন্ট ফাইভ জ্বর নিয়ে বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস উঠল। বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে সেই জ্বর বেড়ে হল একশ চার পয়েন্ট ফাইভ।

ইদরিশ সাহেব ছুটি নিয়ে যান নি। বীণাকে রেখে পরদিনই তাঁকে আসতে হল। বীণা সপ্তাহখানিক জ্বরে ভুগে কঙ্কালের মতো হয়ে গেল। মুখে রুচি নেই। যা খায় তাই বমি করে ফেলে দেয়। রাতে ঘুম হয় না। প্রায় রাতই জেগে-জেগে কাটিয়ে দেয়। চোখের পাতা এক হলেই ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে।

এই সময় তার ভয়ের অসুখ হয়। সারাক্ষণই ভয় লাগে। কোনো কারণ ছাড়াই বাতাসে জানালার পাট নড়ে উঠল— বীণার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করে। সে আতঙ্কে অস্থির হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঘাম হয়।

বীণাদের এই বসতবাড়িটা খুবই পুরানো। বীণার দাদা এক হিন্দু-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে খুব শস্তায় এই বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ি। পুরো জায়গাটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সংস্কারের অভাবে দেয়াল জায়গায়-জায়গায় ভেঙে পড়েছে। দোতলায় ঘরের বেশির ভাগই ব্যবহারের উপযোগী নয়। একতলার তিনটা ঘর শুধু ব্যবহৃত হয়। দোতলার ঘর তালাবদ্ধ থাকে।

একটা ঘরে বীণার বাবা এমদাদ সাহেব থাকেন। প্যারালাইসিসের কারণে এই ঘর থেকে বের হবার তাঁর কোনো উপায় নেই। অন্য একটা ঘরে বীণা এবং বীণার দূর-সম্পর্কের মামি মরিয়ম থাকেন। ঘরের কাজকর্ম করার জন্যে বাতাসী নামের কমবয়সী একটা মেয়ে থাকে। তার চোখে অসুখ আছে। রাতে সে কিছুই দেখে না।

বাড়িতে মানুষ বলতে এই চারটি প্রাণী। সন্ধ্যার পর থেকেই বীণার ভয়-ভয় করে। দোতলার বারান্দায় কিসের যেন শব্দ হয়। মনে হয় খড়ম পড়ে কেউ যেন

হাঁটে। বীণা জানে ইঁদুর শব্দ করছে— তবু তার ভয় কাটে না। দুর্বল নার্ভের কারণেই হয়তো আতঙ্কে তার শরীর কাঁপতে থাকে। সে ফিসফিস করে বলে— কিসের শব্দ মামি?

মামি ঘরের কাজ করতে করতে নির্বিকার গলায় বলেন, জানি না।

'মনে হয় ইঁদুরের শব্দ, তাই না মামি?'

'অন্য কিছু হইতেও পারে।'

'অন্য কিছু কী?'

'সইন্ধ্যা বেলায় এরার নাম নেওন নাই মা। খারাপ বাতাস হইতে পারে।'

'খারাপ বাতাস?'

'কতদিনের পুরানো বাড়ি। উপরের ঘরগুলান খালি পইড়া থাকে। কেউ বাত্তি দেয় না। ঘরে বাত্তি না দিলে খারাপ বাতাসের আনাগোনা হয়।'

'বাতি দেয় না কেন? বাতি দিলেই তো হয়। কাল থেকে রোজ সন্ধ্যায় বাতি দিবেন মামি।'

'আইচ্ছা দিমুনে। অখন ঘুমাও।'

বীণা শুয়ে থাকে। ঘুম আসে না। রাত যতই বাড়তে থাকে দোতলায় শব্দ ততই বাড়তে থাকে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয় বীণার বাবার গোঙানি। গভীর রাতে তিনি হাঁটুর ব্যথায় গোঙানির মতো শব্দ করেন। সেই শব্দও বীণার কানে অমানুষিক শব্দ বলে মনে হয়। যেন বীণার বাবা নয়। অন্য কেউ শব্দ করছে। সেই অন্য কেউ মানুষগোত্রীয় নয়। একধরনের চাপা হাসিও শোনা যায়।

বীণাদের স্নানঘর মূল ঘর থেকে অনেকটা দূরে। স্নানঘর বীণার খুব প্রিয়। শ্যাওলা ধরা দেয়াল-ঘেরা ছোট্ট চারকোণা একটা জায়গা। ভেতরে চৌবাচ্চা আছে। স্নানঘরের ছাদটা ছিল টিনের। গত আশ্বিন মাসের ঝড়ে টিনের ছাদ উড়ে গেছে। সেই ছাদ আর ঠিক করা হয় নি। গোসলের সময় মাথার উপর থাকে খোলা আকাশ। ঠিক দুপুরবেলায় সূর্যের ছায়া পড়ে চৌবাচ্চার পানিতে। মগ ডুবালেই চৌবাচ্চা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে চারদিকের সবুজ দেয়ালে। বীণার বড় ভালো লাগে। দুপুরবেলা বীণার অনেকখানি সময় এই গোসলখানায় কেটে যায়। রোজই মনে হয় গ্রামের বাড়িতে এসে ভালোই হয়েছে। রাতের তীব্র আতঙ্কের কথা তখন আর মনে থাকে না।

এক দুপুরবেলায় এই গোসলখানাতেই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটল। বীণা গোসল করছে। চারদিকে সুনসান নীরবতা। ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়েছে চৌবাচ্চায়। বীণার চমৎকার লাগছে। শরীরটা আগের মতো দুর্বল লাগছে না। সে

আপন মনে খানিকক্ষণ গুনগুন করল।

বীণা মাথায় পানি ঢালল। ঠাণ্ডা পানি। শরীর কেঁপে উঠল। আর তখনি সে অদ্ভুত গন্ধ পেল। অদ্ভুত হলেও গন্ধ চেনা, এই গন্ধ সে আগেও পেয়েছে। বীণা আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ল। নির্জন গোসলখানায় এই গন্ধ এল কোত্থেকে? পোড়া কাঠকয়লার সঙ্গে মেশা নষ্ট দুধের মিশ্র গন্ধ। বীণা মগ ছুড়ে ফেলে গোসলখানার দরজায় আছড়ে পড়ল। দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যেতে হবে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা যাবে না। এক মুহূর্তও না।

আশ্চর্যের ব্যাপার! বীণা দরজা খুলতে পারল না। ছিটকিনি নামানো হয়েছে। বীণা প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে অথচ দরজা এক চুলও নড়ছে না। যেন কেউ তাকে আটকে ফেলেছে। বীণা চিৎকার করবার চেষ্টা করল। গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা তো নড়লই না, কোনো শব্দ পর্যন্ত হল না। অথচ ঘরে অন্য একরকম শব্দ হচ্ছে। যেন কী একটা পড়ছে চৌবাচ্চায়। টুপটাপ শব্দ। বৃষ্টির ফোঁটার মতো।

'কী পড়ছে?'

'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

বীণা হতভম্ব হয়ে দেখল টকটকে লালবর্ণের রক্ত পড়ছে চৌবাচ্চায়। চৌবাচ্চার পানি ক্রমেই ঘোলা হয়ে উঠছে। কেউ একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার গা থেকে।

বীণা সেই দৃশ্য দেখতে চায় না। সে কিছুতেই উপরের দিকে তাকাবে না। সে জানে উপরের দিকে তাকালেই ভয়ংকর কিছু দেখবে। এমন ভয়ংকর কিছু যা ব্যাখ্যার অতীত, অভিজ্ঞতার অতীত।

ভারী, শ্লেষ্মাজড়িত স্বরে কেউ-একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার গা থেকে। ডাকল—বীণা, ও বীণা। শব্দ উপর থেকে আসছে। কেউ-একজন বসে আছে গোসলখানার দেয়ালে। যে বসে আছে তাকে বীণা চেনে। না-দেখেও বীণা বলতে পারছে কে বসে আছে।

'ও বীণা, বীণা।'

বীণা তাকাল। হ্যাঁ, ঐ লোকটিই বসে আছে। তবে লোকটির মুখ পশুর মতো নয়। মায়ামাখা একটি মুখ। বড় বড় চোখদুটি বিষণ্ন ও কালো। লোকটি পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পা দুটি অস্বাভাবিক-থ্যাঁতলানো। চাপচাপ রক্ত সেই থ্যাঁতলানো পা বেয়ে চৌবাচ্চার জলে পড়ছে। লোকটি ভারী শ্লেষ্মাজড়িত স্বরে ডাকল— বীণা, ও বীণা।

বীণা জ্ঞান হারাল।

তার জ্ঞান ফিরল তৃতীয় দিনে জামালপুর সদর হাসপাতালে। চোখ মেলে দেখল আরো অনেকের সঙ্গে বিছানার পাশে ইদরিশ সাহেব বসে আছেন। তাঁকে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছে।

ইদরিশ সাহেব গভীর মমতার সঙ্গে বললেন, কী হয়েছে রে মা?

বীণা ফুঁপাতে-ফুঁপাতে বলল, ভয় পেয়েছি মামা।

ইদরিশ সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ভয় পাবারই কথা। ঐ জংলা বাড়িতে আমি নিজেই ভয় পাই, আর তুই পাবি না? এখানে থাকার দরকার নেই। চল্ আমার সঙ্গে ঢাকায়। ঢাকায় গিয়ে আবার কলেজে যাওয়া-আসা শুরু কর। ঐ ছেলে আর তোকে বিরক্ত করবে না। বেচারা ট্রাক এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

বীণা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

ইদরিশ সাহেব নিজের মনেই বললেন, পায়ের উপর দিয়ে ট্রাক চলে গেছিল। দুটা পা-ই ছাতু হয়ে গেছে। হাসপাতালে নেয়ার আঠারো ঘণ্টা পরে মারা গেছে। খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। না-গেলে অভদ্রতা হয়।

ইদরিশ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ছেলেটা খারাপ ছিল না। বুঝলি? খামোখাই আজেবাজে সন্দেহ করেছি। অতি ভদ্র ছেলে। তোর কথা জিজ্ঞেস করল। বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করল।

বীণার খুব ইচ্ছা করল বলতে—আমার কথা কী জিজ্ঞেস করল মামা? সে বলতে পারল না।

ইদরিশ সাহেব বললেন, ছেলেটার এ্যাকসিডেন্টের খবর তার অঞ্চলে পৌঁছামাত্র সেখানের সব লোক এসে উপস্থিত। হাজার-হাজার মানুষ। হাউমাউ করে কাঁদছে। দেখবার মতো একটা দৃশ্য। বুঝলি বীণা, আমরা মানুষের বাইরেটাই শুধু দেখি। অন্তর দেখি না। এটা খুবই আফসোসের ব্যাপার। তোর যাতে ভালো বিয়ে হয় এইজন্যে আমাকে কিছু টাকাও দিয়ে গেছে। 'না' করতে পারলাম না। একটা মানুষ মারা যাচ্ছে, কী করে 'না' বলি। ঠিক না?

শঙ্খমালা

অনেক রাতে খেতে বসেছি, মা ধরা গলায় বললেন, 'খবর শুনেছিস ছোটন?'

'কী খবর?'

'পরী এসেছে।'

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। মা থেমে-থেমে বললেন, পরীর একটা মেয়ে হয়েছে।'

মায়ের চোখে এইবার দেখা গেল জল। আমি বললাম, 'ছিঃ মা, কাঁদেন কেন?'

মা সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'না কাঁদি না তো; আর দুটি ভাত নিবি?'

আমি দেখলাম মার চোখ ছাপিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। মায়েরা বড় দুঃখ পুষে রাখে।

ছ'বছর আগের পরী আপাকে ভেবে আজ কি আর কাঁদতে আছে? হাত ধুতে বাইরে এসে দেখি ফুটফুটে জোছনা নেমেছে। চারদিকে কী চমৎকার আলো। উঠোনের লেবু গাছের লম্বা কোমল ছায়া সে আলোয় ভাসছে। কতদিনের চেনা ঘরবাড়ি কেমন অচেনা লাগছে আজ।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন আমার অন্ধ বাবা। তাঁর পাশে একটি শূন্য টুল। ঘরের সমস্ত কাজ সেরে আমার মা এসে বসলেন সেখানে। ফিসফিস করে কিছু কথা হবে। দুজনেই তাকিয়ে থাকবেন বাইরে। একজন দেখবেন উথাল-পাথাল জোছনা, অন্যজন অন্ধকার।

বাবা মৃদু স্বরে ডাকলেন, ছোটন, ও ছোটন!

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি তাঁর অন্ধ চোখে তাকালেন আমার দিকে। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, পরী এসেছে শুনেছিস?

'শুনেছি।'

'আচ্ছা যা।'

আজ আমাদের বড় দুঃখের দিন। পরী আজ এসেছেন। কাল খুব ভোরে তাদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়তো দেখা যাবে তিনি হাসি-হাসি মুখে শিমুলগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। শিমুল তুলো উড়ে এসে পড়ছে তাঁর চোখেমুখে। আমাকে দেখে হয়তো খুশি হবেন। হয়তো বা হবেন না। পরী আপাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে।

আমরা খুব দুঃখ পুষে রাখি। হঠাৎ-হঠাৎ এক-একদিন আমাদের কত পুরনো কথা মনে পড়ে। বুকের ভেতর আচমকা ধাক্কা লাগে। চোখে জল এসে পড়ে। এমন কেন আমরা?

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছি, আমার মা হাত ধুতে কলঘরে যাচ্ছেন। মাথার কাপড় ফেলে তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর অনেক সময় নিয়ে অজু করলেন। একসময় এসে বসলেন শূন্য টুলটায়। বাবা ফিসফিস করে বললেন, খাওয়া হয়েছে তোমার?

'হুঁ। তোমার বুকে তেল মালিশ করে দেব?'

'না।'

তারপর দুজন নিঃশব্দে বসেই রইলেন, বসেই রইলেন। লেবু গাছের ছায়া ক্রমশ ছোট হতে লাগল। এত দূর থেকে বুঝতে পারছি না কিন্তু মনে হচ্ছে আমার মা কাঁদছেন। বাবা তাঁর শীর্ণ হাতে মার হাত ধরলেন। কফ-জমা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কাঁদে না, কাঁদে না।

বাবা তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীকে আজ আবার তিরিশ বছর আগের মতো ভালবাসুক। আমার মা'র আজ বড় ভালোবাসার প্রয়োজন। আমি তাঁদের ভালোবাসার সুযোগ দিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়। মা ব্যাকুল হয়ে ডাকলেন, কোথায় যাস ছোটন?

'এই একটু হাঁটব রাস্তায়।'

'দেরি করবি না তো?'

'না।'

মা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, ছোটন তুই কি পরীদের বাসায় যাচ্ছিস?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন, যেতে চায় যাক না। যাক।

রাস্তাটি নির্জন। শহরতলীর মানুষরা সব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। তারস্বরে ঝিঁঝি ডাকছে চারপাশে। গাছে-গাছে নিশি-পাওয়া পাখিদের ছটফটানি। তবু মনে হচ্ছে চারপাশ কী চুপচাপ।

রাস্তায় চিনির মতো শাদা ধুলো চিকমিক করে। আমি একা একা হাঁটি। মনে হয় কত যুগ আগে যেন অন্য কোনো জন্মে এমন জোছনা হয়েছিল। বড়দা আর আমি গিয়েছিলাম পরী আপাদের বাসায়। আমার লাজুক বড়দা শিমুলগাছের আড়াল থেকে মৃদুস্বরে ডেকেছিলেন, পরী ও পরী।

লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসেছিলেন পরীর মা। হাসিমুখে বলছিলেন,

'ওমা তুই? কবে এলি রে? কলেজ ছুটি হয়ে গেল?'

'ভালো আছেন খালা? পরী ভালো আছে?'

খবর পেয়ে পরী হাওয়ার মতো ছুটে এসেছিল ঘরের বাইরে।

এক পলক তাকিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিল, ইশ! কতদিন পর কলেজ ছুটি হল আপনার।

আমার মুখচোরা লাজুক দাদা ফিসফিসিয়ে বলছিলেন—পরী, তুমি ভালো আছ?

'হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো। তোমার জন্য গল্পের বই এনেছি পরী।'

এসব কোন্ জন্মের কথা ভাবছি? হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে এসব কি সত্যি-সত্যি কখনো ঘটেছিল? একজন বৃদ্ধা মা, একজন অন্ধ বাবা— এরা ছাড়া কোনোকালে কি কেউ ছিল আমার?

পরী আপার বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়ালাম। খোলা উঠোনে চেয়ার পেতে পরী আপা চুপচাপ বসে আছেন। পাশে একটি শূন্য চেয়ার। পরী আপার বর হয়তো উঠে গেছেন একটু আগে। পরী আপা আমাকে দেখে স্বাভাবিক গলায় বললেন, ছোটন না?

'হ্যাঁ।'

'উহ! কতদিন পর দেখা। বোস এই চেয়ারটায়।'

'আপনি ভালো আছেন পরী আপা?'

'হ্যাঁ, আমার মেয়ে দেখবি? বোস নিয়ে আসছি।'

লাল জামা গায়ে ডল-পুতুলের মতো একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করে ফিরে আসলেন তিনি।

'দেখ্, অবিকল আমার মতো হয়েছে। তাই না?'

'হ্যাঁ, কী নাম রেখেছেন মেয়ের?'

'নীরা। নামটা তোর পছন্দ হয়?'

'চমৎকার নাম।'

অনেকক্ষণ বসে রইলাম আমি। একসময় পরী আপা বললেন, বাড়ি যা ছোটন। রাত হয়েছে।

বাবা আর মা তেমনি বসে আছেন। বাবার মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। তাঁর সারা মাথায় দুধের মতো শাদা চুল। মা দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে। পায়ের শব্দে চমকে উঠে বাবা বললেন, ছোটন ফিরলি?

'জি।'

'পরীদের বাসায় গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ।'

অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হল না। আমরা তিনজন চুপচাপ বসে রইলাম।

এক সময় বাবা বললেন, পরী কিছু বলেছে?

'না।'

মা'র শরীর কেঁপে উঠল। একটি হাহাকারের মতো তীক্ষ্ণস্বরে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন, "আমার বড় খোকা। আমার বড় খোকা।"

এনড্রিন খেয়ে মরা আমার অভিমানী দাদা যে প্রগাঢ় ভালোবাসা পরী আপার জন্যে সঞ্চিত করে রেখেছিলেন তার সবটুকু দিয়ে বাবা আমার মাকে কাছে টানলেন। ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলেন মার কুঞ্চিত কপালে। ফিসফিস করে বললেন, কাঁদে না, কাঁদে না।

ভালোবাসার সেই অপূর্ব দৃশ্যে আমার চোখে জল আসল। আকাশ ভরা জোছনার দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললুম— পরী আপা, আজ তোমাকে ক্ষমা করেছি।

অচিন বৃক্ষ

ইদরিশ বলল, ভাইজান ভালো কইর‍্যা দেহেন। এর নাম অচিন বৃক্ষ।

বলেই থু করে আমার পায়ের কাছে একদলা থুতু ফেলল। লোকটির কুৎসিত অভ্যাস, প্রতিটি বাক্য দুবার করে বলে। দ্বিতীয়বার বলার আগে একদলা থুতু ফেলে।

ভাইজান ভালো কইরা দেহেন, এর নাম অচিন বৃক্ষ।

অচিন পাখির কথা গানের মধ্যে প্রায়ই থাকে, আমি অচিন বৃক্ষের কথা এই প্রথম শুনলাম এবং দেখলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরা সবাই বৃক্ষ শব্দটা উচ্চারণ করছে শুদ্ধভাবে। তৎসম শব্দের উচ্চারণে কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে না। অচিন বৃক্ষ না বলে অচিন গাছও বলতে পারত, তা বলছে না। সম্ভবত গাছ বললে এর মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষিত হয় না।

ইদরিশ বলল, ভালো কইরা দেহেন ভাইজান, ত্রিভুবনে এই বৃক্ষ নাই।

তাই নাকি?

জে। ত্রিভুবনে নাই।

ত্রিভুবনে এই গাছ নাই শুনেও আমি তেমন চমৎকৃত হলাম না। গ্রামের মানুষের কাছে ত্রিভুবন জায়গাটা খুব বিশাল নয়। এদের ত্রিভুবন হচ্ছে আশেপাশের আট-দশটা গ্রাম। হয়তো আশেপাশে এরকম গাছ নাই।

কেমন দেখতেছেন ভাইজান?

ভালো।

এইরকম গাছ আগে কোনোদিন দেখছেন?

না।

ইদরিশ বড়ই খুশি হল। থু করে বড় একদলা থুতু ফেলে খুশির প্রকাশ ঘটাল।

বড়ই আচানক, কী বলেন ভাইজান?

আচানক তো বটেই।

ইদরিশ এবার হেসেই ফেলল। পান খাওয়া লাল দাঁত প্রায় সব ক'টা বের হয়ে এল। আমি মনে-মনে বললাম, কী যন্ত্রণা! এই অচিন বৃক্ষ দেখার জন্যে আমাকে মাইলের উপরে হাঁটতে হয়েছে। বর্ষা কবলিত গ্রামে দু'মাইল হাঁটা যে কী জিনিস, যারা কোনোদিন হাঁটেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। জুতা খুলে খালিপায়ে হাঁটতে হয়েছে। হুক ওয়ার্মের জীবাণু যে শরীরে ঢুকে গেছে সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।

গাছটা দেখতাছেন কেমন কন দেহি ভাইজান?

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। এরা শুধু গাছ দেখিয়ে খুশি নয়, প্রশংসাসূচক কিছুও শুনতে চায়। আমি কোনো বৃক্ষ-প্রেমিক নই। সব গাছ আমার কাছে একরকম মনে হয়।

আশেপাশে মানুষদেরই আমি চিনি না, গাছ চিনব কী করে? মানুষজন তাও কথা বলে, নিজেদের পরিচিত করার চেষ্টা করে। গাছেরা তেমন কিছুই করে না।

অচিন বৃক্ষ কেমন দেখলেন ভাইজান?

আমি ভালো করে দেখলাম। মাঝারি সাইজের কাঁঠালগাছের মতো উঁচু, পাতাগুলি তেঁতুলগাছের মতো ছোট-ছোট, গাছের কাণ্ড পাইনগাছের কাণ্ডের মতো মসৃণ। গাছ প্রসঙ্গে কিছু না বললে ভালো দেখায় না বলেই বললাম, ফুল হয়?

ইদরিশ কথা বলার আগেই, পাশে দাঁড়ানো রোগা লোকটা বলল, জে না— ফুল ফুটনের 'টাইম' হয় নাই। 'টাইম' হইলেই ফুটবে। এই গাছে ফুল আসতে মেলা 'টাইম' লাগে।

বয়স কত এই গাছের?

তা ধরেন দুই হাজারের কম না। বেশিও হইতে পারে।

বলেই লোকটা সমর্থনের আশায় চারদিকে তাকাল। উপস্থিত জনতা অতি দ্রুত মাথা নাড়তে লাগল। যেন এই বিষয়ে কারো মনেই সন্দেহের লেশমাত্র নেই। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। গ্রামের লোকজন কথাবার্তা বলার সময় তাল ঠিক রাখতে পারে না। হুট করে বলে দিল দু-হাজার বছর। আর তাতেই সবাই কেমন মাথা নাড়ছে। আমি ইদরিশের দিকে তাকিয়ে বললাম, ইদরিশ মিয়া, গাছ তো দেখা হল, চল যাওয়া যাক।

আমার কথায় মনে হল সবাই খুব অবাক হচ্ছে।

ইদরিশ হতভম্ব গলায় বলল, এখন যাইবেন কী? গাছ তো দেখাই হইল না। তার উপরে, মাস্টার সাবরে খবর দেওয়া হইছে। আসতাছে।

আমার চারপাশে সতেরো-আঠারোজন মানুষ আর একপাল উলঙ্গ শিশু। অচিন বৃক্ষের লাগোয়া বাড়ি থেকে বউ-ঝিরা উঁকি দিচ্ছে। একজন এক কাঁদি ডাব পেড়ে নিয়ে এল। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, কালো রঙের বিশাল একটা চেয়ারও একজন মাথায় করে আনছে। এই গ্রামের এটাই হয়তো একমাত্র চেয়ার। অচিন বৃক্ষ যাঁরা দেখতে আসেন তাদের সবাইকে এই চেয়ারে বসতে হয়।

অচিন বৃক্ষের নিচে চেয়ার পাতা হল। আমি বসলাম। কে-একজন হাতপাখা দিয়ে আমাকে প্রবল বেগে হাওয়া করতে লাগল। স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব চলে এলেন। বয়স অল্প, তবে অল্প বয়সেই গালটাল ভেঙে একাকার। দেখেই মনে হয় জীবনযুদ্ধে পরাজিত একজন মানুষ। বেঁচে থাকতে হয় বলেই বেঁচে আছেন। ছাত্র পড়াচ্ছেন। হেডমাস্টার সাহেবের নাম মুহম্মদ কুদ্দুস। তাঁর সম্ভবত হাঁপানি আছে। বড়-বড় করে শ্বাস নিচ্ছেন। নিজেকে সামলে কথা বলতে অনেক সময় লাগল।

স্যারের কি শইল ভালো?

জি ভালো।

আসতে একটু দেরি হইল। মনে কিছু নিবেন না স্যার।

না মনে কিছু নিচ্ছি না।

বিশিষ্ট লোকজন শহর থাইক্যা অচিন বৃক্ষ দেখতে আসে, বড় ভালো লাগে। বিশিষ্ট লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

আপনি ভুল করছেন ভাই। আমি বিশিষ্ট কেউ নই।

এই তোমরা স্যারকে হাত-পা ধোয়ার পানি দেও নাই, বিষয় কী?

হাত-পা ধুয়ে কী হবে? আবার তো কাদা ভাঙতেই হবে।

হেডমাস্টার সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, খাওয়াদাওয়া করবেন না? আমার বাড়িতে পাক-শাক হইতেছে। চাইরটা ডাল-ভাত, বিশেষ কিছু না। গেরাম দেশে কিছু জোগাড়যন্ত্রও করা যায় না। বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন। গত বৎসর ময়মনসিংহের এডিসি সাহেব আসছিলেন। এডিসি রেভিন্যু। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। অচিন বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এক হাজার টাকা দেওয়ার ওয়াদা করলেন।

তাই নাকি?

জি। অবশ্যি টাকা এখনো পাওয়া যায় নাই। এরা কাজের মানুষ। নানান কাজের চাপে ভুলে গেছেন আর কী। আমাদের মতো তো না যে কাজকর্ম কিছু

নাই। এদের শতেক কাজ। তবু ভাবতেছি একটা পত্র দিব। আপনে কী বলেন?

দিন । চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দিন।

আবার বিরক্ত হন কি-না কে জানে । এরা কাজের মানুষ, চিঠি দিয়ে বিরক্ত করাও ঠিক না। এই চায়ের কী হইল?

চা হচ্ছে না-কি ?

জি, বানাতে বলে এসেছি। চায়ের ব্যবস্থা আমার বাড়িতে আছে। মাঝে-মধ্যে হয়। বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন। এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসার সাহেব এসেছিলেন, বিরাট জ্ঞানী লোক। এদের দেখা পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, কী বলেন স্যার?

তা তো বটেই।

চা চলে এল।

চা খেতে-খেতে এই গ্রামের অচিন বৃক্ষ কী করে এল সেই গল্প হেডমাস্টার সাহেবের কাছে শুনলাম। এক ডাইনি না-কি এই গাছের উপর 'সোয়ার' হয়ে আকাশপথে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার পানির পিপাসা হয়। এইখানে সে নামে। পানি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারিত করে। পানি ছিল বড়ই মিঠা। ডাইনি তখন সন্তুষ্ট হয়ে গ্রামের লোকদের বলে— তোমাদের মিঠা পানি খেয়েছি, তার প্রতিদানে এই গাছ দিয়ে গেলাম। গাছটা যত্ন করে রাখবে। অনেক অনেক দিন পরে গাছে ফুল ধরবে। তখন তোমাদের দুঃখ থাকবে না। এই গাছের ফুল সর্বরোগের মহৌষধ। একদিন উপাস থেকে খালিপেটে এই ফুল খেলেই হবে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আপনি এই গল্প বিশ্বাস করেন?

হেডমাস্টার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস না করার তো কিছু নাই।

যে যুগে মানুষ চাঁদে হাঁটাহাঁটি করছে সেই যুগে আপনি বিশ্বাস করছেন গাছে চড়ে ডাইনি এসেছিল?

জগতে অনেক আচানক ব্যাপার হয় জনাব। যেমন ধরেন ব্যাঙের মাথায় মণি। যে মণি সাত রাজার ধন। অন্ধকার রাতে ব্যাঙ এই মণি শরীর থেকে বের করে। তখন চারদিক আলো হয়ে যায়। আলো দেখে পোকারা আসে। ব্যাঙ সেই পোকা ধরে ধরে খায়।

আপনি ব্যাঙের মণি দেখেছেন?

জি জনাব। নিজের চোখে দেখা। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

আমি চুপ করে গেলাম। যিনি ব্যাঙের মণি নিজে দেখেছেন বলে দাবি করেন

তাঁর সঙ্গে কুসংস্কার নিয়ে তর্ক করা বৃথা। তাছাড়া দেখা গেল ব্যাঙের মণি তিনি একাই দেখেন নি— আমার আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের অনেকেও দেখেছে।

দুপুরে হেডমাস্টার সাহেবের বাসায় খেতে গেলাম। আমি এবং ইদরিশ। হেডমাস্টার সাহেবের হতদরিদ্র অবস্থা দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। প্রাইমারি স্কুলের একজন হেডমাস্টার সাহেবের যদি এই দশা হয় তখন অন্যদের না-জানি কী অবস্থা। অথচ এর মধ্যেই পোলাও রান্না হয়েছে। মুরগির কোরমা করা হয়েছে। দরিদ্র মানুষটির অনেকগুলি টাকা বের হয়ে গেছে এই বাবদে।

আপনি এসেছেন বড় ভালো লাগতেছে। আজ পাড়াগাঁয়ে থাকি। দু একটা জ্ঞানের কথা নিয়ে যে আলাপ করব সেই সুবিধা নাই। চারদিকে মূর্খের দল। অচিন বৃক্ষ থাকায় আপনাদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসেন। বড় ভালো লাগে। কিছু জ্ঞানের কথা শুনতে পারি।

বেচারা জ্ঞানের কথা শুনতে চায়। কোনো জ্ঞানের কথাই আমার মনে এল না। আমি বললাম, রান্না তো চমৎকার হয়েছে। কে রেঁধেছে, আপনার স্ত্রী?

জি না জনাব। আমার কনিষ্ঠ ভগ্নী। আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী।

সে-কী?

হার্টের বাল্বের সমস্যা। ঢাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তাররা বলেছেন, লাখ দুই টাকা খরচ করলে একটা-কিছু করা যাবে। কোথায় পাব এত টাকা বলেন দেখি।

আমি চুপ করে গেলাম। হেডমাস্টার সাহেব সহজ ভঙ্গিতে বললেন, আপনি যখন আসছেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিব। সে শহরের মেয়ে। মেট্রিক পাস।

তাই নাকি?

জি। মেট্রিক ফার্স্ট ডিভিশন ছিল। টোটেল মার্ক ছয়শ এগারো। জেনারেল অঙ্কে পেয়েছে ছিয়াত্তর। আর চারটা নম্বর হলে লেটার হত।

হেডমাস্টার সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

ওর আবার লেখালেখির শখ আছে।

বলেন কী!

শরীরটা যখন ভালো ছিল তখন কবিতা লিখত। তা এই মূর্খের জায়গায় কবিতার মতো জিনিস কে বুঝবে বলেন? আপনি আসছেন দু-একটা পড়ে দেখবেন।

জি নিশ্চয়ই পড়ব।

মহসিন সাহেব বলে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি একটি কবিতার কপি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন অনেক পত্রিকার সাথে তাঁর যোগাযোগ আছে, ছাপিয়ে দিবেন।

ছাপা হয়েছে?

হয়েছে নিশ্চয়ই। কবিতাটা ভালো ছিল, নদীর উপরে লেখা। পত্রিকা-টত্রিকা তো এখানে কিছু আসে না। জানার উপায় নাই। একটা পত্রিকা পড়তে হলে যেতে হয় মশাখালির বাজার। চিন্তা করেন অবস্থা। শেখ সাহেবের মৃত্যুর খবর পেয়েছি দুদিন পরে, বুঝলেন অবস্থা।

অবস্থা তো খারাপ বলেই মনে হচ্ছে।

তাও অচিন বৃক্ষ থাকায় দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ আছে। আসেন ভাইসাব, আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলেন। সে শহরের মেয়ে। ময়মনসিংহ শহরে পড়াশোনা করেছে।

আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। অপরিচিতি অসুস্থ একজন মহিলার সঙ্গে আমি কী কথা বলব? ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে অচিন বৃক্ষ দেখতে যাঁরা আসেন তাঁদের সবাইকে এই মহিলার সঙ্গেও দেখা করতে হয়।

মহিলার সঙ্গে দেখা হল।

মহিলা না বলে মেয়ে বলাই উচিত। উনিশ-কুড়ির বেশি বয়স হবে না। বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। মানুষ নয় যেন মিশরের মমি। বিশিষ্ট অতিথিকে দেখে তার মধ্যে কোনো প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না। তবে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। হেডমাস্টার সাহেব তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লেন। পরক্ষণেই হাসিমুখে বললেন, আপনাকে সালাম দিচ্ছে।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। কিছু-একটা বলতে হয় অথচ বলার মতো কিছু পাচ্ছি না। মেয়েটি আবার বিড়বিড় করে কী যেন বলল, হেডমাস্টার সাহেব বললেন— রেনু বলছে আপনার খাওয়াদাওয়ার খুব কষ্ট হল। ওর কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। আমি পারি।

আমি বললাম, চিকিৎসা হচ্ছে তো? নাকি এমনি রেখে দিয়েছেন?

হেডমাস্টার সাহেব এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মেয়েটি বিড়বিড় করে আবারো কী যেন বলল। হেডমাস্টার সাহেব বুঝিয়ে দিলেন— ও জিজ্ঞেস করছে অচিন বৃক্ষ দেখে খুশি হয়েছেন কিনা।

আমি বললাম, হয়েছি। খুব খুশি হয়েছি। মেয়েটি বলল, ফুল ফুটলে আরেকবার আসবেন। ঠিকানা দিয়ে যান। ফুল ফুটলে আপনাকে চিঠি লিখবে।

মেয়েটি এই কথাগুলি বেশ স্পষ্ট করে বলল, আমার বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না। আমি বললাম, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি যাই।

হেডমাস্টার সাহেব আমাকে এগিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। আমি রাজি হলাম না। এই ভদ্রলোকের এখন উচিত তার স্ত্রীর কাছে থাকা। যত বেশি সময় সে তার স্ত্রীর পাশে থাকবে ততই মঙ্গল। এই মেয়েটির দিনের আলো যে নিবে এসেছে তা যে-কেউ বলে দিতে পারে।

আমি এবং ইদরিশ ফিরে যাচ্ছি।

আসার সময় যতটা কষ্ট হয়েছিল ফেরার সময় ততটা না। আকাশে মেঘ করায় রোদের হাত থেকে রক্ষা হয়েছে। তার উপর ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। ইদরিশের সঙ্গে গল্প করতে-করতে এগুচ্ছি।

আমি বললাম, হেডমাস্টার সাহেব তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করাচ্ছে না?

করাইতাছে। বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল সব গেছে পরিবারের পিছনে। অখন বাড়ি-ভিটা পর্যন্ত বন্দক।

তাই নাকি?

জি। এই মানুষটা পরিবারের জন্যে পাগল। সারারাতই ঘুমায় না। স্ত্রীর ধারে বইস্যা থাকে। আর দিনের মধ্যে দশটা চক্কর দেয় অচিন বৃক্ষের কাছে।

কেন?

ফুল ফুটেছে কিনা দেখে। অচিন বৃক্ষের ফুল হইল অখন শেষ ভরসা।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

খেয়াঘাটের সামনে এসে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। দেখা গেল হেডমাস্টার সাহেব ছুটতে-ছুটতে আসছেন। ছুটে-আসাজনিত পরিশ্রমে খুবই কাহিল হয়ে পড়া একজন মানুষ, যার সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ছুটে আসার কারণ হচ্ছে স্ত্রীর কবিতার খাতা আমাকে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। মনে পড়ায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

আমরা একটা অশ্বত্থ গাছের ছায়ার নিচে বসলাম। হেডমাস্টার সাহেবকে খুশি করার জন্যেই দু-নম্বরি খাতার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত পড়ে বললাম, খুব ভালো হয়েছে।

হেডমাস্টার সাহেবের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, এখন আর কিছু লিখতে পারে না। শরীরটা বেশি খারাপ।

আমি বললাম, শরীর ভালো হলে আবার লিখবেন।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, আমিও রেনুকে সেইটাই বলি, অচিন বৃক্ষের ফুল ফুটারও বেশি বাকি নাই। ফুল ফুটার আগে পচা শ্যাওলার গন্ধ ছাড়ার কথা। গাছ সেই গন্ধ ছাড়া শুরু করেছে। আর কেউ সেই গন্ধ পায় না। আমি পাই।

আমি গভীর মমতায় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি ইতস্তত করে বললেন, প্রথম কবিতাটা আরেকবার পড়েন স্যার। প্রথম কবিতাটার একটা ইতিহাস আছে।

কী ইতিহাস?

হেডমাস্টার সাহেব লাজুক গলায় বললেন, রেনুকে আমি তখন প্রাইভেট পড়াই। একদিন বাড়ির কাজ দিয়েছি। বাড়ির কাজের খাতা আমার হাতে দিয়ে দৌড় দিয়া পালাইল। আর তো আসে না। খাতা খুইল্যা দেখি কবিতা। আমারে নিয়া লেখা। কী সর্বনাশ বলেন দেখি। যদি এই খাতা অন্যের হাতে পড়ত, কী অবস্থা হইত বলেন?

অন্যের হাতে পড়বে কেন? বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে দিবে আপনার হাতেই।

তা ঠিক। রেনুর বুদ্ধির কোনো মা-বাপ নাই। কী বুদ্ধি, কী বুদ্ধি! তার বাপ-মা বিয়ে ঠিক করল— ছেলে পুবালী ব্যাংকের অফিসার। চেহারাসুরত ভালো। ভালো বংশ। পান-চিনি হয়ে গেল। রেনু চুপ করে রইল। তারপর একদিন তার মা'রে গভীর রাতে ঘুম থেকে ডেকে বলল, মা তুমি আমারে বিষ জোগাড় কইরা দেও। আমি বিষ খাব। রেনুর মা বললেন, কেন? রেনু বলল— আমি একজনরে বিবাহ করব কথা দিছি, এখন অন্যের সঙ্গে বিবাহ হইতেছে। বিষ ছাড়া আমার উপায় নাই। কতবড় মিথ্যা কথা, কিন্তু বলল ঠাণ্ডা গলায় । ঐ বিয়ে ভেঙে গেল। রেনুর মা-বাবা তাড়াহুড়া করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। নিজের ঘরের কথা আপনাকে বলে ফেললাম, আপনি স্যার মনে কিছু নিবেন না।

না — আমি কিছু মনে করি নি।

সবাইরেই বলি। বলতে ভালো লাগে।

হেডমাস্টারের চোখ চকচক করতে লাগল। আমি বললাম, আপনি ভাববেন না। আপনার স্ত্রী আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তিনি জড়ানো গলায় বললেন, একটু দোয়া করবেন স্যার। ফুলটা যেন তাড়াতাড়ি ফুটে।

পড়ন্ত বেলায় খেয়া নৌকায় উঠলাম। হেডমাস্টার সাহেব মূর্তির মতো ওপারে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই একধরনের প্রতীক্ষার ভঙ্গি আছে। সেই প্রতীক্ষা অচিন বৃক্ষের অচিন ফুলের জন্যে। যে প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে

হতদরিদ্র গ্রামের অন্যসব মানুষরাও। এবং কী আশ্চর্য, আমার মতো কঠিন নাস্তিকের মধ্যেও সেই প্রতীক্ষার ছায়া। নদী পার হতে-হতে আমার কেবলি মনে হচ্ছে— আহা ফুটুক। অচিন বৃক্ষে একটি ফুল হলেও ফুটুক। কত রহস্যময় ঘটনাই তো এ পৃথিবীতে ঘটে। তার সঙ্গে যুক্ত হোক আরও একটি।

হেডমাস্টার সাহেবও পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। তার হাতে হাতির ছবি আঁকা দু-নম্বরি একটা কবিতার খাতা। দূর থেকে কেন জানি তাঁকে অচিন বৃক্ষের মতো লাগছে। হাতগুলি যেন অচিন বৃক্ষের শাখা। বাতাস পেয়ে দুলছে।

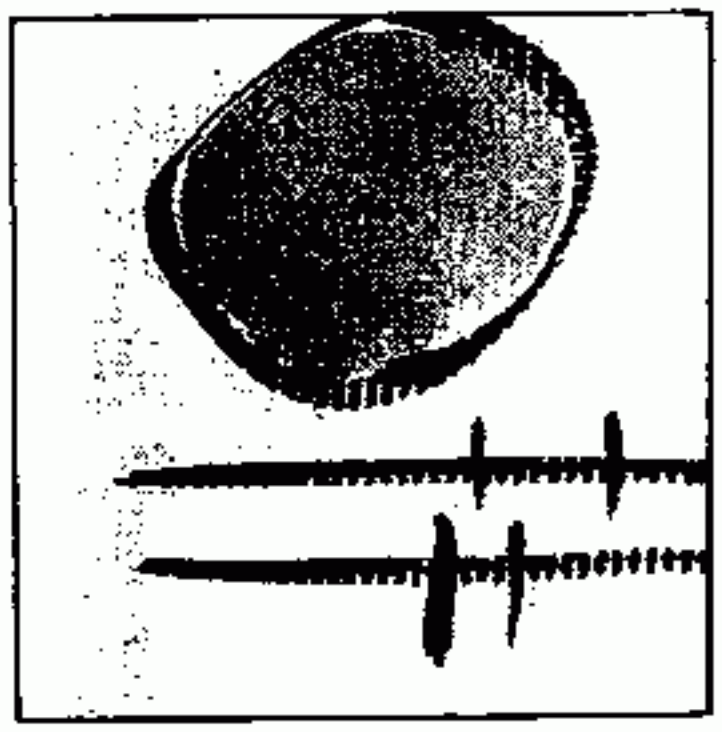

নিশিকাব্য

পরী মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে এসে দেখে চমৎকার জোছনা হয়েছে। চিকমিক করছে চারদিক। সে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। এরকম জোছনায় মন খারাপ হয়ে যায়।

বেশ রাত হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকেছে অনেক আগে। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। শুধু আজিজ, সাপ-খেলানো সুরে পরীক্ষার পড়া পড়ছে। পরীর এখন আর কিছুই করার নেই। সে একাকী উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল।

কী করছ ভাবী ?

পরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হারিকেন হাতে রুনু এসে দাঁড়িয়েছে। সে হালকা গলায় বলল, ঘুমুবে না ভাবী ?

ঘুমুব। দাঁড়া একটু। কী চমৎকার জোছনা দেখবি ?

হুঁ।

আয় রুনু, তোকে একটা জিনিস দেখাই।

কী জিনিস?

ঐ দেখ জামগাছটার কেমন ছায়া পড়েছে। অবিকল মানুষের মতো না? হাত-পা সবই আছে।

ওমা, তাই তো। রুনু তরল গলায় হেসে উঠল।

পরী বলল, কুয়োতলায় একটু বসবি নাকি রে রুনু? চল্ বসি গিয়ে।

তোমার মেয়ে জেগে উঠে যদি?

বেশিক্ষণ বসব না, আয়।

কুয়োতলাটা বাড়ি থেকে একটু দূরে। তার দুপাশে দুটি প্রকাণ্ড শিরীষ গাছ। জায়গাটা বড় নিরিবিলি। রুনু বলল, কেমন অন্ধকার দেখেছ ভাবী ? ভয় ভয় লাগে।

দূর, ভয় কিসের। বেশ হাওয়া দিচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ।

দুজনেই কুয়োর বাঁধানো পাশটায় চুপচাপ বসে রইল। ঝিরঝির বাতাস বইছে। বেশ লাগছে বসে থাকতে। পরী কী মনে করে যেন হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসছ কেন ভাবী ?

এমনি। রাস্তায় একটু হাঁটবি নাকি।

কোথায়?

চল্ না, হাঁটতে-হাঁটতে পুকুরপাড়ের দিকে যাই। বেশ লাগছে না জোছনাটা?

রুনু সে-কথার জবাব না দিয়ে ভয়-পাওয়া গলায় বলল, দেখ ভাবী, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ঐখানটায়?

শিরীষ গাছের নিচে যেখানে ঘন হয়ে অন্ধকার নেমেছে, সেখানে শাদামতো কী-একটি যেন নড়ে উঠল।

কে ওখানে? কথা বলে না যে, কে?

কেউ সাড়া দিল না। রুনু পরীর কাছে সরে এল। ফিসফিস করে বলল, ভাবী, ছোট ভাইজানকে ডাক দাও।

তুই দাঁড়া না, আমি দেখছি। ভয় কিসের এত?

সাহস দেখাতে হবে না ভাবী, তুমি ছোট ভাইজানকে ডাকো।

শিরীষ গাছের নিচের ঘন অন্ধকার থেকে একটা লোক হেসে উঠল। হাসির শব্দ শুনেই রুনু বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল— বড় ভাইজান এসেছে। বড় ভাইজান এসেছে।

পর মুহূর্তেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়িতে খবর দিতে।

আনিস স্যুটকেস কুয়োতলায় নামিয়ে পরীর পাশে এসে দাঁড়াল। পরী কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। তার কেন জানি চোখে পানি এসে পড়ল।

টুকুন ভালো আছে, পরী?

হুঁ।

আর তুমি?

ভালো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?

তোমাদের আসতে দেখে দাঁড়ালাম। কী মনে করেছিলে— ভূত?

পরী তার জবাব না দিয়ে হঠাৎ নিচু হয়ে কদমবুসি করল। আনিস অপ্রস্তুত হাসল।

কী যে কর তুমি পরী, লজ্জা লাগে।

ততক্ষণে হারিকেন হাতে বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছে। পরী বলল, তুমি আগে যাও। স্যুটকেস থাক, রশীদ নিয়ে যাবে।

আনিস হাসিমুখে হাঁটতে লাগল।

বাড়ির উঠানে আনিস এসে দাঁড়াতেই আনিসের মা কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অভ্যাসই এরকম। যে-কোনো খুশির ব্যাপারে মরাকান্না কাঁদতে বসেন। কেউ ধমক দিয়ে না-থামলে সে কান্না থামে না। আনিসের বাবা চেঁচিয়ে বললেন, একটা জলচৌকি এনে দে না কেউ, বসুক। সবগুলি হয়েছে গাধা। রুনু হাঁ করে দেখছিস কী? পাখা এনে হাওয়া কর।

আনিসের ছোটভাই আজিজ বলল, খবর দিয়ে আসে নাই কেন দাদা? খবর দিলেই ইস্টিশনে থাকতাম।

আনিস কিছু বলল না। জুতোর ফিতা খুলতে লাগল। আনিসের মা'র কান্না তখনো থামে নি। এবার আজিজ ধমক দিল।

আহ্ মা, তোমার ঘ্যানঘ্যানানি থামাও।

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কান্না থেমে গেল। সহজ ও স্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, তোর শরীরটা এত খারাপ হল কী করে রে আনিস? পেটের ঐ অসুখটা সারে নি? চিকিৎসা করাচ্ছিস তো বাবা?

সবাই লক্ষ্য করল আনিসের শরীর সত্যি খারাপ হয়েছে। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে। গাল ভেতরে বসে গেছে। আনিসের বাবা বললেন, স্বাস্থ্য খারাপ হবে না? মেসের খাওয়া। পাঁচ বছর মেসে থাকলাম, জানি তো সব। বুঝলে আনিসের মা, মেসে খাওয়ার ধারাই ঐ।

পরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আনিসের জন্য নতুন করে রান্না চড়াতে হবে। তবু তার ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। পরীর শাশুড়ি একসময় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ও কী বউমা, সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন? রান্না চড়াও গিয়ে। তার আগে আনিসকে চা দাও এক কাপ।

পরী অপ্রস্তুত হয়ে রান্নাঘরে চলে এল। রুনু এল তার পিছু-পিছু।

রুনু হেসে বলল, আমি চা বানিয়ে আনছি, তুমি ভাইজানের কাছে থাকো ভাবী। পরী লজ্জা পেয়ে হাসল।

তুই তো ভারী ফাজিল হয়েছিস রুনু।

হয়েছি তো হয়েছি। তোমাকে একটা কথা বলি ভাবী।

কী কথা?

রুনু ইতস্তত করতে লাগল। পরী অবাক হয়ে বলল, বল না কী বলবি।

বাবা আমার যেখানে বিয়ে ঠিক করেছেন সেটা আমার পছন্দ না ভাবী। ভাইজানকে বুঝিয়ে বলবে তুমি। দোহাই তোমার।

পরী আশ্চর্য হয়ে বলল, পছন্দ হয় নি কেন রুনু? ছেলেটা তো বেশ ভালোই। কত জায়গা জমি আছে। তার উপর স্কুলে মাস্টারি করে।

করুক। আমার একটুও ভালো লাগে নি। কেমন ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসছিল দেখতে এসে। না-না ভাবী, তোমার পায়ে পড়ি।

আচ্ছা-আচ্ছা, পায়ে পড়তে হবে না। আমি বলব।

রুনু খুশি হয়ে বলল, তুমি বড় ভালো মেয়ে ভাবী।

তাই নাকি?

হুঁ। ভাইজান হঠাৎ আসায় তোমার খুব খুশি লাগছে তাই না?

পরী জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে হাসতে লাগল।

বল না ভাবী খুব খুশি লাগছে?

লাগছে।

রুনু ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। থেমে বলল, ভাইজানের চাকরিটা বড় বাজে। বৎসরে দশটা দিন ছুটি নেই। গত ঈদে পর্যন্ত আসল না।

পরী কিছু বলল না। চায়ের কাপে চিনি ঢালতে লাগল।

রুনু বলল, এবার তুমি বাসা করে ভাইজানের সঙ্গে থাকো ভাবী। মেসের খাওয়া খেয়ে তার শরীর কী হাল হয়েছ দেখেছ?

পরী মৃদুস্বরে বলল, দুই জায়গায় খরচ চালানো কি সহজ কথা? অল্প ক'টা টাকা পায়। চা হয়ে গেছে, নিয়ে যা রে রুনু।

রুনু চা নিয়ে এসে দেখে তার বিয়ে নিয়েই আলাপ হচ্ছে। বাবা বলছেন, ছেলে হল তোমার বি.এ. ফেল। তবে এবার প্রাইভেট দিচ্ছে। বংশটংশ খুবই ভালো। ছেলের এক মামা ময়মনসিংহে ওকালতি করেন। তাঁকে এক ডাকে সবাই চিনে।

আনিসের মা বলেছেন, ছেলে দেখতে-শুনতে খারাপ না—রঙটা একটু মাজা। পুরুষমানুষের ফরসা রঙ কী আর ভালো? ভালো না।

আনিস বলল, রুনুর পছন্দ হয়েছে তো? তার পছন্দ হলে আর আপত্তি কী?

পাশের বাড়ি থেকে আনিসের ছোটচাচা এসেছেন খবর পেয়ে। তিনি বললেন, রুনুর আবার পছন্দ-অপছন্দ কী? আমাদের পছন্দ নিয়ে কথা।

আনিস রুনুর দিকে তাকিয়ে হাসল। লজ্জা পেয়ে রুনু চলে এল রান্নাঘরে।

আনিসের বাবা বললেন, কাল বিকালে না হয় ছেলেটাকে খবর দিয়ে আনি। তুই দেখ।

কাল বিকাল পর্যন্ত তো থাকব না বাবা। আজ শেষরাতেই যাব।

সে কী!

ছুটি নিয়ে আসি নি তো। কোম্পানি একটা কাজে পাঠিয়েছিল ময়মনসিংহ। অনেকদিন আপনাদের দেখি নাই। কাজটাও হয়ে গেল সকাল-সকাল। তাই আসলাম।

একটা দিন থাকতে পারিস না?

উঁহুঁ। কাল অফিস ধরতেই হবে। প্রাইভেট কোম্পানি, বড় ঝামেলার চাকরি।

আনিস একটা নিশ্বাস ফেলল। সবাই চুপ করে গেল হঠাৎ। চার মাস পর এসেছে আনিস। আবার কবে আসবে কে জানে। আনিসের মা কাঁপা গলায় বললেন, তোর বড় সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে দে না।

আনিস হেসে উঠল। গায়ের শার্ট খুলতে-খুলতে বলল, বড়কর্তা যদি কোনোমতে টের পায় আমি বাড়িতে এসে বসে আছি তাহলেই চাকরি নট হয়ে যাবে। গোসল করব মা, গা কুটকুট করছে।

কুয়োয় করবি? পানি তুলে দেবে?

উঁহুঁ, পুকুরে করব। পুকুরে মাছ আছে রে আজিজ?

আছে ভাইজান। বড়-বড় মৃগেল মাছ আছে।

আনিসের পিছু-পিছু পুকুরপাড়ে সবাই এসে পড়ল। আনিসের বাবা আর মা পাড়ে বসে রইলেন। আজিজ 'ভীষণ গরম লাগছে' এই বলে আনিসের সঙ্গে গোসল করতে নেমে গেল। ঝুনু ঘাটের উপর তোয়ালে আর সাবান নিয়ে অপেক্ষা করছে। আনিসের সবচেয়ে ছোটবোন ঝুনু, ঘুমিয়ে পড়েছিল। আনিস ভোর রাত্রে চলে যাবে শুনে তার ঘুম ভাঙানো হয়েছে। সেও এসে চুপচাপ রুনুর পাশে বসেছে। শুধু পরী আসে নি। দুটি চুলোয় রান্না চাপিয়ে সে আগুনের আঁচে বসে আছে একাকী।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে-হতে অনেক রাত হল। আনিসকে ঘিরে গোল হয়ে সবাই বসে গল্প করতে লাগল। উঠোনে শীতল পাটিতে বসেছে গল্পের আসর। এর মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রুনু ঘুমুচ্ছে। চমৎকার চাঁদনি, সেইসঙ্গে মিষ্টি হাওয়া। কারুর উঠতে ইচ্ছে করছে না। পরীর কাজ শেষ হয় নি। সে বাসনকোসন নিয়ে ধুতে গেছে ঘাটে। এক সময় রুনু বলল, ভাইজান এখন ঘুমোতে যাক মা। রাত

শেষ হতে দেরি নেই বেশি। আনিসের বাবা বললেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা রে তুই ঘুমুতে যা। রুনু তুই বউ-মাকে পাঠিয়ে দে। বাসন সকালে ধুলেই হবে।

ঘরের ভিতর হারিকেন জ্বলছিল। আনিস সলতে বাড়িয়ে দিল। টুকুন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আনিস চুমু খেল তার কপালে। পরীর দিকে তাকিয়ে বলল, জ্বর নাকি টুকুনের?

হুঁ।

কবে থেকে?

কাল থেকে। সর্দি জ্বর। ও কিছু না। ঘাম দিচ্ছে, এক্ষুনি সেরে যাবে।

আনিস পরীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। পরীর লজ্জা করতে লাগল। পরী বলল, হাসছ কেন?

এমনি। পরী তোমার জন্যে শাড়ি এনেছি একটা। দেখ তো পছন্দ হয় কিনা।

পরী খুশি-খুশি গলায় বলল, অনেকগুলি পয়সা খরচ করলে তো।

শাড়িটা পর, দেখি কেমন তোমাকে মানায়।

রুনুর জন্যে একটা শাড়ি আনলে না কেন? বেচারির একটাও ভালো শাড়ি নেই।

পয়সায় কুলোলে আনতাম। আরেকবার আসার সময় আনব।

পরী ইতস্তত করে বলল, আমার একা একা শাড়ি নিতে লজ্জা লাগবে। এইটি রুনুর জন্যে থাক। আরেকবার নিয়ে এসো আমার জন্যে।

আনিস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেশ থাক তবে, আজ রাতের জন্য পর না দেখি?

শাড়ির ভাঁজ ভেঙে যাবে যে। রুনু মনে করবে আমার জন্যে এনেছিলে পরে তাকে দিয়েছ।

আচ্ছা, তাহলে থাক।

পরী লজ্জিত স্বরে বলল, বিয়ের শাড়িটা পরব? যদি বল তাহলে পরি।

পরী লজ্জায় লাল হয়ে ট্রাঙ্কের তালা খুলতে লাগল। আনিস বলল, টুকুন দেখতে তোমার মতো হয়েছে, তাই না?

হ্যাঁ, আব্বা তাকে ছোট পরী ডাকে। আচ্ছা টুকুনের একটা ভালো নাম রাখ না কেন?

জরী রাখব তার নাম।

জরী আবার কেমন নাম?

তোমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখলাম। পরীর মেয়ে জরী।

পরী হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, অন্যদিকে তাকিয়ে থাক, শাড়ি বদলাব।

কী হয় অন্য দিকে তাকালে?

আহ্ শুধু অসভ্যতা।

আনিস মাথা নিচু করে টুকুনকে আদর করতে লাগল। পরী হালকা গলায় বলল, দেখ তো কেমন লাগছে?

একেবারে লাল পরী।

ইশ, শুধু ঠাট্টা।

রান্নাঘর থেকে ধুপধুপ শব্দ উঠছে।

আনিস বলল, এত রাতে ধান কুটছে কেন?

ধান কুটছে না চাল ভাঙছে। তোমার জন্যে পিঠা তৈরি হবে।

নিশ্চয়ই রুনুর কাণ্ড।

আনিস পরীর হাত ধরে তাকে কাছে টানল। পরীর চোখে আবার পানি এসে পড়ল। গাঢ়স্বরে বলল, আবার কবে আসবে?

জুলাই মাসে।

কতদিন থাকবে তখন?

অ-নে-ক দিন।

তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন? পেটের ঐ ব্যথাটা এখনো হয়?

হয় মাঝে-মাঝে।

টুকুন কেঁদে জেগে উঠল। পরী বলল, জ্বর আরো বেড়েছে। ও টুকুন সোনা, কে এসেছে দেখ। দেখ তোমার আব্বু এসেছে।

আনিস বলল, আমার কোলে একটু দাও তো পরী। আরে-আরে মেয়ের একটা দাঁত উঠেছে দেখছি। কী কাণ্ড। ও টুকুন, ও জরী, একটু হাস তো মা। ও সোনামণি, দেখি তোমার দাঁতটা?

টুকুন তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। তাই দেখে আনিস ও পরী দুজনেই হাসতে লাগল।

আমার জরী সোনা কথা শিখছে নাকি, পরী?

হুঁ। মা বলতে পারে। আর পাখি দেখলে বলে, ফা ফা।

আনিস হো-হো করে হেসে উঠল যেন ভীষণ একটা হাসির কথা। হাসি থামলে বলল, আমার জরী তোমার চেয়েও সুন্দর হবে। তাই না পরী?

আমি আবার সুন্দর নাকি?

না, তুমি ভীষণ বিশ্রী।

আনিস আবার হেসে উঠল। তার একটু পরেই বাইরে কাক ডাকতে লাগল। আনিসের বাবার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ও আনিস, ও আনিস।

জি বাবা।

এখন রওনা না দিলে ট্রেন ধরতে পারবি না বাবা।

আনিস টুকুনকে শুইয়ে দিল বিছানায়। পরী কোনো কথা বলল না।

আনিস বাইরে বেরিয়ে দেখল চাঁদ হেলে পড়েছে। জোছনা ফিকে হয়ে এসেছে। বিদায়ের আয়োজন শুরু হল। ঘুমন্ত ঝুনুকে আবার ঘুম থেকে টেনে তোলা হল। সে হঠাৎ বলে ফেলল, ভাবী আজ বিয়ের শাড়ি পরেছে কেন?

কেউ তার কথার কোনো জবাব দিল না। মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী আকাশের চাঁদ। পরীকে অহেতুক লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যেই হয়তো একখণ্ড বিশাল মেঘের আড়ালে তার সকল জোছনা লুকিয়ে ফেলল।

লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল আনিস। শেষরাতের ট্রেনটা যেন কিছুতেই মিস না হয়।

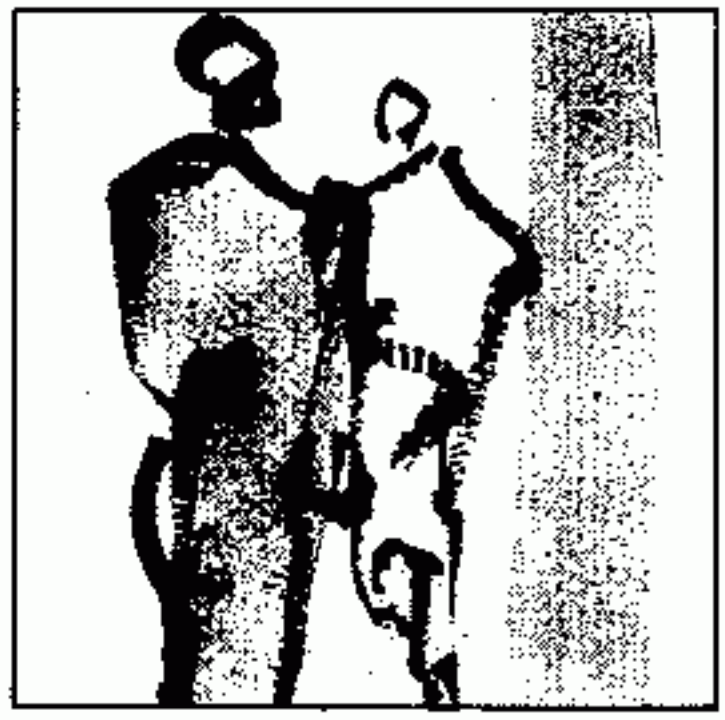

শ্যামল ছায়া

খুটখুট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

কয়েক মুহূর্ত সে নিশ্বাস নিতে পারল না, দম আটকে এল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রহিমার এরকম হয়। আজ একটু বাড়াবাড়ি হল, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। রহিমা ভয় পেয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, মজিদ মিয়া, ও মজিদ মিয়া।

মজিদ শেষপ্রান্তে থাকে। এত দূরে গলার আওয়াজ পৌছানোর কথা নয়। তবু রহিমার মনে হল মজিদ বিছানা ছেড়ে উঠেছে, দরজা খুলছে শব্দ করে! এই আবার যেন কাশল। রহিমা চিকন সুরে দ্বিতীয়বার ডাকল, ও মজিদ মিয়া— ও মজিদ।

কিন্তু কেউ এল না। মজিদ তাহলে শুনতে পায় নি। চোখে পানি এসে গেল রহিমার। হাঁপাতে-হাঁপাতে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর একসময় হঠাৎ করে ব্যথাটা মরে গেল। নিশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। একটু আগেই যে মরে যাবার মতো অনুভূতি হয়েছে তাও পর্যন্ত মনে রইল না।

নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে এল রহিমা। বালিশের নিচ থেকে দেয়াশলাই নিয়ে হারিকেন ধরাল। খুব আস্তে অনেকটা সময় নিয়ে দরজার খিল খুলল। রাতের বেলা ঝনঝন করে দরজা খুললে মজিদ বিরক্ত হয়। বাইরে বেশ শীত, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কার্তিক মাসের শুরুতেই শীত নেমে গেছে এবার। বাঁ হাতে হারিকেন উঁচু করে ধরে পা টিপে-টিপে মজিদের ঘরের পাশে এসে দাঁড়াল রহিমা। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে মজিদ এখনো জেগে। বুকের নিচে বালিশ দিয়ে উবু হয়ে শুয়ে বই পড়ছে। ঘরের মেঝেতে আধ-খাওয়া সিগারেটের আস্তরণ । কটু গন্ধ আসছে সিগারেটের। রহিমা কোনো সাড়া শব্দ করল না। চুপচাপ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগল।

রহিমা ভেবে পায় না এত রাত জেগে কী পড়ে ছেলেটা। পরীক্ষার পড়া তো কবেই শেষ হয়েছে। রহিমা অনেকক্ষণ হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে তার যখন ঝিমুনি এসে গেল তখন মৃদু গলায় ডাকল, ও মজিদ মিয়া।

মজিদ বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, ঠিক করে ডাকো মা। কী সবসময় মিয়া মিয়া কর।

রহিমা একটু অপ্রস্তুত হল। (মজিদকে মজিদ মিয়া ডাকলে সে রাগ করে কিন্তু রহিমার একটুও মনে থাকে না) রহিমা বলল, শুয়ে পড় মজিদ।

তুমি ঘুমাও গিয়ে। ঘ্যানঘ্যান করো না।

রহিমা মৃদু গলায় বলল, জানালা বন্ধ করে দেই? ঠাণ্ডা বাতাস।

মজিদ সে-কথার জবাব দিল না। বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগল। রহিমা তবুও দাঁড়িয়ে রইল। তার ঘুমুতে ইচ্ছে করছিল না। কে জানে আবার হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে, দম বন্ধ হয়ে যাবার কষ্টটা নতুন করে শুরু হবে। মজিদ রাগী গলায় বলল, যাও না মা, দাঁড়িয়ে থেকো না।

রহিমা জানালার পাশ থেকে সরে এল। মজিদকে তার ভয় করে। অথচ জন্মের সময় সে এই এতটুকুন ছিল। রাতদিন ট্যা-ট্যা করে কাঁদত। মজিদের বাবা বলত, এই ছেলে বাঁচবে না গো, এরে বেশি মায়া করলে কষ্ট পাবে।

ছিঃ ছিঃ কী অলক্ষুণি কথা। বাপ হয়ে কেউ এরকম বলে? লোকটার ধারাই এমন, কথার কোনো মা-বাপ নাই।

রহিমা এসে শুয়ে পড়ল। ঘুমুতে তার ভালো লাগে না। তাই ঘুম তাড়াতে নানা কথা ভাবে। রাত জেগে ভাববার মতো ঘটনা তার বেশি নেই। ঘুরেফিরে প্রতি রাতে একই কথা সে ভাবে। যেন সে একা একা একটি সাজানো ঘরে বসে আছে। হইচই হচ্ছে খুব। মনটা বেশি ভালো নেই। ভয়-ভয় করছে এবং একটু কান্না পাচ্ছে তার। এমন সময় বড়ভাবী মজিদের বাবাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই বললেন,"নাও তোমার জিনিস । এখন দুজনে মিলে ভাব-সাব কর।" এই বলে বাইরে থেকে খুট করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। নতুন শাড়ি পরে জড়সড় হয়ে বসে আছে রহিমা। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। কী বলবে তা-ও ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় কী কাণ্ডটাই না হল। কথাবার্তা নেই হড়হড় করে লোকটা বমি করে বিছানা ভাসিয়ে ফেলল। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে রহিমা তাকে এসে ধরল। ভাবতে-ভাবতে চোখ ভিজে উঠে। আহা নতুন বউয়ের সামনে কী লজ্জাটাই না পেয়েছিল লোকটা। কতদিনকার কথা অথচ মনে হয় এই তো সেদিন।

অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে রহিমা উঠে বসল। পানের বাটা থেকে পান বের করল। সুপুরি কাটল ফুঁচি-ফুঁচি করে। পান মুখে দিয়ে আগের মতো চুপি-চুপি মজিদের জানালায় উঁকি দিল। না এখনো ঘুমায় নি। রহিমা মজিদের কোনো ব্যাপারই বুঝতে পারে না। লেখাপড়া না-জানা মূর্খ বাপ-মা'র ছেলে যদি বৃত্তিটৃত্তি পেয়ে পাস করতে-করতে এম. এ. পাস করে ফেলে তাহলে সে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

একসময় মজিদের চোখ গিয়ে পড়ে জানালায়। 'এ কী মা, এখনো ঘুরঘুর করছ? ঘুমাও না কেন?'

যাই বাবা যাই।

রহিমার নিজেকে খুব অসহায় মনে হল। বারান্দায় এসে বসে রইল একা একা। আধখানা চাঁদ উঠেছে। আলোয় আবছাভাবে সবকিছু নজরে পড়ে। রাতের বেলা একলা লাগে তার। বুকের মধ্যে হু-হু করে। দিনের বেলাটা এতটা খারাপ লাগে না। ঘরের কত কাজকর্ম আছে। কাজের লোক নেই। তাকেই সব করতে হয়। সময়টা বেশ কেটে যায়। বাসার কাছেই মাইকের দোকান আছে একটা। তারা সারাদিনই কোনো গানের সিকিখানা, কোনো গানের আধাআধি বাজায়। বেশ লাগে।

মজিদের বাবারও গান ভালো লাগত। এক-একবার গান শুনে চেঁচিয়ে বলেছে, 'ফাস ক্লাস, ফাস ক্লাস।' মজিদের বাপ লোকটা আমোদ-আহ্লাদের বড় কাঙাল ছিল। বদনসিব লোক। আমোদ-আহ্লাদ তার ভাগ্যে নাই। কোনোদিন হয়তো জামাটামা পরে খুশি হয়ে গেছে সিনেমা দেখতে। ফিরে এসেছে মুখ কালো করে। হয় টিকিট পায় নি, নয়তো পকেট মার গেছে। কোনো বিয়ের দাওয়াতটাওয়াত পেলে হাসিমুখে গিয়েছে কিন্তু খেতে পায় নি কিছু। তার খাওয়ার আগেই খাবার শেষ হয়ে গেছে। নিজের ছেলেটা যখন লেখাপড়া শেষ করেছে, চাকরিবাকরি করে বাপকে আরাম দেবে, তখনি কথা নেই বার্তা নেই বিছানায় শুয়েই শেষ। রহিমা রান্নাঘর থেকে বলেছে পর্যন্ত— অসময়ে ঘুমাও কেন? চা খাবে, চা দিব?

রহিমা সেই মন্দভাগ্য লোকটার কথা ভেবে নিশ্বাস ফেলল। এমন খারাপ ভাগ্যের লোক আছে দুনিয়ায়? মরণের সময়ও যার পাশে কেউ রইল না। মজিদের তখন কোনো খোঁজ নেই। কোথায় নাকি গিয়েছে মিটিং করতে। তার বাপকে কাফন পরিয়ে খাটিয়ায় তুলে সবাই যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলে হাঁক দিয়েছে তখন মজিদ নেমেছে রিকশা থেকে। বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছে, কী হয়েছে?

আহা লোকটা সারাজীবন কী কষ্টটা না করল। কী কষ্ট! কী কষ্ট! মেকানিকের আর কয় পয়সা বেতন? বাড়ির জমিজমা যা ছিল বেচে পড়ার খরচ চলল মজিদের। এত কষ্টের পয়সায় পড়ে আজ মজিদের এই হাল। সন্ধ্যা নামতেই বন্ধুরা আসে। মিটিং বসে ঘরে। ট্রেড ইউনিয়ন, মৎস্য সমবায় সমিতি, হেনো তেনো। ছিঃ।

মজিদের মাথায় কিসের পোকা ঢুকেছিল কে জানে। মজিদের বাপকে রহিমা কত বলেছে, ছেলেকে এসব করতে মানা কর গো, কোনোদিন পুলিশে ধরবে তাকে। মজিদের বাপ শুধু বলেছে— বুঝদার বিদ্বান ছেলে, আমি মূর্খ মানুষ, আমি কী বলব?

রহিমার শীত করছিল, সে ঘরের ভেতর চলে গেল। অন্ধকার ঘরে ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা লাগল কিসের সঙ্গে । পিতলের বদনা ঝনঝন করে গড়িয়ে গেল কতদূর। মজিদ ঘুম-জড়ানো স্বরে বলল, কে কে?

আমি।

আর কোনো সাড়াশব্দ হল না। রহিমা যখন ভাবছে আবার শুয়ে পড়বে কি না, তখনি শুনল মজিদ বেশ শব্দ করে হাসছে। কী কাণ্ড । রহিমা ডাকল, ও মজিদ মিয়া।

কী?

হাস কেন?

এমনি হাসি। ঘুমাও তো, ফ্যাসফ্যাস করো না।

না, মজিদকে রহিমা সত্যি বুঝতে পারে না। শুধু মজিদ নয়, মজিদের বন্ধুদেরও অচেনা লাগে। ঠিক সন্ধ্যাবেলায় তারা আসে। চোখের দৃষ্টি তাদের কেমন-কেমন। কথা বলে থেমে-থেমে, নিচু গলায় হাসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে তাদের আলাপ। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পাশের রইসুদ্দীনের চায়ের স্টল থেকে দফায়-দফায় চা আসে। কিসের এত গল্প তাদের? রহিমা দরজায় কান লাগিয়ে শুনতে চেষ্টা করে।

না ইলেকশন হবে না। পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

কিন্তু না হলে আমাদের করণীয় কী?

শেখ সাহেব কী ভাবছেন তা জানা দরকার।

শেখ সাহেব আপস করবেন। সাফ কথা।

সাদেক বেশি বাড়াবাড়ি করছে। একটু কেয়ারফুল না হলে ...

রহিমার কাছে সমস্তই দুর্বোধ্য মনে হয়। তবু রোজ দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে সে শোনে। আর যদি কোনোদিন শিখা নামের মেয়েটি আসে তবে তো কথাই নেই। রহিমা জোঁকের মতো দরজার সঙ্গে সেঁটে থাকে। শিখা আসে লম্বা একটি

নক্‌শীদার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে। একটুও সাজগোজ করে না, তবু কী সুন্দর লাগে তাকে। সে হাসতে-হাসতে দরজায় ধাক্কা দেয়। ভেতর থেকে মজিদ গম্ভীর হয়ে বলে, কে কে? (যদিও হাসির শব্দ শুনেই মজিদ বুঝতে পেরেছ কে, তবু তার এই ঢংটা করা চাই-ই।)

আমি, আমি শিখা।

অগ্নিশিখা নাকি?

না, আমি প্রদীপশিখা।

বলতে-বলতে মেয়েটা হাসিতে ভেঙে পড়ে। দরজা খুলে মজিদ বেরিয়ে আসে। মজিদের চোখমুখ তখন অন্যরকম মনে হয়। দেখেশুনে রহিমার ভালো লাগে না। কে জানে শিখাকে হয়তো পছন্দ করে ফেলেছে। হয়তো এই মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে রেখেছে অথবা মজিদের বাপ সুতাখালীর ঐ শ্যামলা মেয়েটির সঙ্গে মজিদের বিয়ে দেবে বলে কী খুশি (টাঙ্গাইলের লালপাড় একটি শাড়িও সে দিয়েছে হাসিনা নামের ঐ ভালোমানুষ মেয়েটিকে। রহিমা মেয়েটিকে দেখে নি, শুনেছে খুব নরম মেয়ে আর ভীষণ লক্ষ্মী)। আহা মজিদের বাপ বেচারা বিয়েটা দিতে পারল না! আহা!

রহিমা কতবার দেখেছে শিখা এলেই মজিদ কেমন অস্থির হয়ে উঠে। শুধু-শুধু হো হো করে হাসে। চায়ের সঙ্গে খাবার আনতে নিজেই উঠে যায়। কথাবার্তার মাঝখানে ফস করে বলে, আজ আর ইলেকশন-ফিলেকশন ভালো লাগছে না। আজ অন্য আলাপ করব। ঘরে যারা থাকে তারা উসখুস করলেও আপত্তি করে না। শুধু হাসি নয়, গানটানও হয়। শিখা মেয়েটি মাঝে-মাঝে গান গায় (তার জন্য সবাইকে খুব সাধ্যসাধনা করতে হয়। খুব অহংকারী মেয়ে)।

রহিমা বুঝতে পারে না এত রাত পর্যন্ত মেয়েমানুষ কী করে আড্ডা দেয়। মজিদের বাপ এইসব দেখেও কোনোদিন কথা বলে নি। শুধু বলেছে— বুঝদার বিদ্বান ছেলে, আমি কী করব?

মজিদের বাপ লোকটাও কী কম বুঝদার ছিল? চুপ করে থাকলে কী হবে, দুনিয়ার হাল অবস্থা ঠিক বুঝত। রহিমার কতবার মনে হয়েছে পড়াশুনা করতে পেলে এই লোকটাও বন্ধুদের সাথে সন্ধ্যাবেলা ইংরেজিতে গল্প করত। নসিবে দেয় নি। ইমানদার লোক বদনসিব হয়।

রহিমা আবার বিছানা ছেড়ে উঠল। বাতি জ্বালাল। একা একা অন্ধকার ঘরে ভালো লাগে না। যুদ্ধের পর তেলের যা দাম হয়েছে। কে আর সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখবে? ঐ ঘরে মজিদ আবার ঘুমের মধ্যে খুক-খুক করে কাশছে। নতুন

হিম পড়েছে। রহিমা কতবার বলেছে জানালা বন্ধ করে ঘুমুতে। কিন্তু মজিদ কিছুতেই শুনবে না। বন্ধ ঘরে তার নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। মজিদের বাপেরও এরকম বদঅভ্যাস ছিল। মাঘ মাসের শীতেও জানালা খোলা রাখা চাই। একবার তো খোলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার শার্ট আর গেঞ্জি নিয়ে গেল। শার্টের পকেটে ছয় টাকা ছিল। কী মুশকিল। শেষপর্যন্ত মজিদের বাপ ছোট্ট এক শার্ট গায়ে দিয়ে কারখানায় গেছে। আহা একটা শার্ট ছিল না লোকটার । কম বেতনের চাকরি। তার উপর পয়সা জমানো নেশা। খুব ধুমধাম করে মজিদের বিয়ে দিবে সেইজন্যে পাই পয়সাটিও জমিয়ে রাখা।

শিখা মেয়েটির সঙ্গে মজিদের পরিচয় না হলে সুতাখালীর ঐ মেয়েটির সঙ্গে কত আগেই মজিদের বিয়ে হয়ে যেত। আর বিয়ে হলে কি বউ ফেলে যুদ্ধে যেত মজিদ? কোনোদিন না। গ্রামের মধ্যে বউ নিয়ে লুকিয়ে থাকত কিছুদিন। তারপর সব ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসত সবাই।

কিন্তু সেরকম হল না। শিখা মেয়েটি বাহারি ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আসতেই থাকল। আসতেই থাকল। আর দিনদিন সুন্দর হতে থাকল মেয়েটা।

তখন খুব গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। মজিদের ঘরে দিনরাত লোকজনের ভিড়। আগের মতো শিখা মেয়েটির তীক্ষ্ণ হাসি শোনা যায় না। রহিমা বুঝতে পারে খুব খারাপ সময়। দেশের অবস্থা ভালো না। কিন্তু দেশের অবস্থা দিয়ে রহিমা কী করবে? সে শুধু দেখে তার নিজেরই কপাল মন্দ। মন্দ কপাল না হলে কি মজিদ তার বাপকে বলে— দেশের অবস্থা খুব খারাপ। কী হয় বোঝা যাচ্ছে না। তোমরা গ্রামে চলে যাও।

মজিদের বাপ বলেছে, তুই গেলে আমরা যাব।

আরে কী বল পাগলের তো। আমি কী করে যাই ? আমার কত কাজ এখন। তোমরা কবে যাবে বল? আমি সব ব্যবস্থা করে দেই।

মজিদের বাপ সে-কথার জবাব না দিয়ে ফস করে একটা বিড়ি ধরিয়েছে আর মজিদ হঠাৎ করে প্রসঙ্গ পাল্টে নিচু গলায় বলেছে, শিখাকে বিয়ে করলে তোমাদের আপত্তি নেই তো বাবা?

মজিদের বাপ একটুও অবাক না হয়ে বলেছে, কবে বিয়ে?

সে দেরি আছে। তোমাদের আপত্তি আছে কি না তাই বল।

না, আপত্তি কিসের জন্যে? বিয়েটা সকাল-সকাল করে ফেললেই তো ভালো হয়। টাকার জন্যে ভাবিস না তুই। তোর বিয়ের টাকা আলাদা করে পোস্টাপিসে জমা আছে।

ছেলের বিয়ে দেখে যেতে পারল না। রহিমা যখন রান্না ঘরে ডাল চাপিয়ে খোঁজ নিতে এসেছে লোকটা চা-টা কিছু খাবে কিনা তখনি জেনেছে সব শেষ। সব আল্লার ইচ্ছা।

তারপর তো যুদ্ধই শুরু হল। গ্রামের বাড়িতে রহিমাকে রেখে মজিদ উধাও । কত উড়ো খবর কানে আসে। কোথায় নাকি একশ মুক্তিবাহিনীর ছেলে ধরা পড়েছে। কোথায় নাকি চারজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে মিলিটারি পুড়িয়ে মেরেছে। রহিমা শুধু মন্ত্রের মতো বলেছে, 'মজিদের হায়াৎ ভিক মাংগি গো আল্লাহ। তুমি নেকবান। হাসবুনাল্লাহে নিয়ামুল ওয়াকিল নেয়ামুল মওলা ওয়া নিয়ামুন নাসির।' রহিমার রাতে ঘুম হয় না। জেগে-জেগে রাত কাটে। সেই সময়ই অসুখটা হল। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মনে হয় মৃত্যু বুঝি এসে বসেছে বুকের উপর।

যুদ্ধ থেমে গেল। মজিদ ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাসিমুখে একদিন দরজার সামনে এসে ডাকল, মা আমি মরি নাই গো। দেখ বেঁচে আছি।

অসুখটা তখন খুব বাড়ল রহিমার। ক্র্যাচের খটখট শব্দ তুলে মজিদ যখন এক পায়ে হেঁটে বেড়ায় তখন রহিমার বুক ধড়ফড় করে। কী কষ্ট, কী কষ্ট। সে মজিদের মতো ভাবতে চেষ্টা করে, 'একটি স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য।'

মজিদ বলে না কিছু, কিন্তু রহিমা জানে শিখার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সেই ছেলেটি নিশ্চয়ই মজিদের মতো ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটে না।

'স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য।' রহিমা মজিদের মতো ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু রহিমা মজিদ নয় । জীবন তার সুবিশাল বাহু রহিমার দিকে প্রসারিত করে নি। কাজেই তার ঘুম আসে না।

শেষরাতে যখন চাঁদ ডুবে গিয়ে নক্ষত্রের আলোয় চারদিক অন্যরকম হয়, তখন সে চুপি-চুপি মজিদের জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় । ভাঙা গলায় ডেকে উঠে, 'ও মজিদ মিয়া, ও মজিদ মিয়া'। সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে মজিদের ঘুম ভাঙে না। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করবার জন্যেই হয়তো শেষরাতের দিকে তার গাঢ় ঘুম হয়।

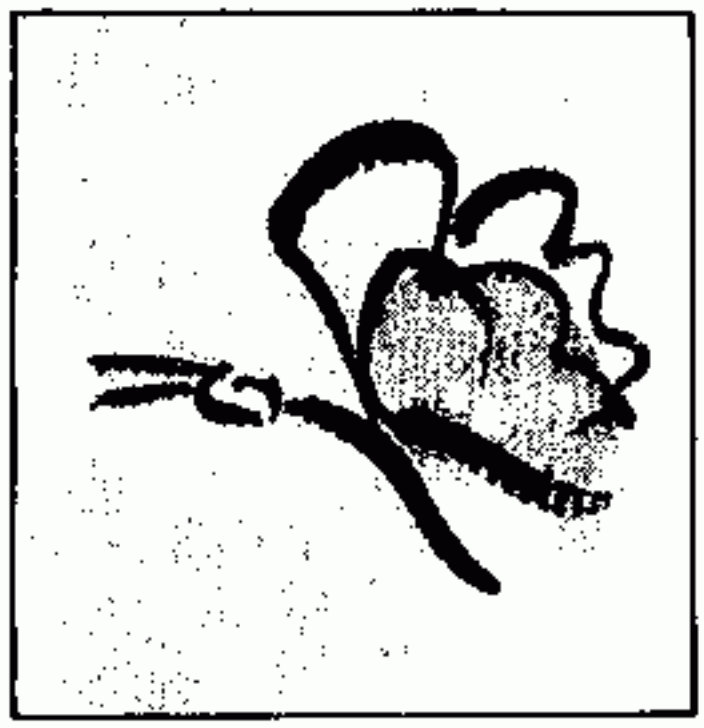

ভালোবাসার গল্প

নীলু কঠিন মুখ করে বলল, কাল আমাকে দেখতে আসবে।

রঞ্জু নীলুর কথা শুনল বলে মনে হল না। দমকা বাতাস দিচ্ছিল। খুব কায়দা করে তাকে সিগারেট ধরাতে হচ্ছে। কথা শুনবার সময় নেই।

নীলু আবার বলল, আগামী কাল সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে আসবে।

কে আসবে?

মাঝে-মাঝে রঞ্জুর বোকামিতে নীলুর গা জ্বালা করে। এখনো তাই করছে।

রঞ্জু আবার বলল, কে আসবে সন্ধ্যাবেলা?

নীলু থেমে থেমে বলল, আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। পাত্র দেখতে আসবে।

রঞ্জুকে এ খবরে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হল না। সে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আসুক না।

আসুক না মানে? যদি আমাকে পছন্দ করে ফেলে?

রঞ্জু গম্ভীর হয়ে বলল, পছন্দ করবে না মানে? তোমাকে যেই দেখবে সেই ট্যারা হয়ে যাবে।

নীলু রেগে গিয়ে বলল, তোমার মতো যারা গাধা শুধু তাদের চোখই ট্যারা হবে।

রঞ্জু রাস্তার লোকজনদের সচকিত করে হেসে উঠল। নীলু বলল, আস্তে হাঁটো না, দৌড়াচ্ছ কেন?

রঞ্জু এ-কথাতেও হেসে উঠল। কী কারণে জানি তার আজ খুব ফুর্তির মুড দেখা যাচ্ছে। গুনগুন করে গানের কী একটা সুর ভাঁজল। সচরাচর এরকম দেখা যায় না। রাস্তায় সে ভারিক্কি চালে হাঁটে।

নীলু সিনেমা দেখবে নাকি একটা?

না।

চল না যাই।

নীলু চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

কথা বল না যে? দেখবে?

উঁহুঁ। বাড়িতে বকবে।

কেউ বকবে না। মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা যখন হয় তখন মায়েরা তাদের কিছু বলে না।

কে বলেছে তোমাকে?

আমি জানি। তখন মায়েদের মন খুব খারাপ থাকে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। এইসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপার তুমি বুঝবে না। চল একটা সিনেমা দেখি।

না।

বেশ তাহলে চল কোনো ভালো রেস্টুরেন্টে বসে চা খাওয়া যাক।

নীলু সরু চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, খুব পয়সা হয়েছে দেখি।

রঞ্জু আবার হেসে উঠল, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল, কী ভেবেছ তুমি? রোজ তোমার পয়সায় চা খাব? এই দেখ।

দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট বের হল। নীলু কোনো কথা বলল না।

তুমি এত গম্ভীর কেন নীলু?

তোমার মতো শুধু-শুধু হাসতে পারি না। বাসায় যাব, এখন চা-টা খাব না।

প্লিজ নীলু, এরকম কর কেন তুমি?

রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। রঞ্জু ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে বলল, বেশ হয়েছে। যতক্ষণ বৃষ্টি না থামবে ততক্ষণ বন্দি।

সে এবার আরাম করে আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীলু বলল, এই নিয়ে ক'টি সিগারেট খেলে?

এটা হচ্ছে ফিফ্‌থ।

সত্যি?

হুঁ।

গা ছুঁয়ে বল।

আহ কী সব মেয়েলি ব্যাপার। গা ছুঁয়ে বললে কী হয়?

হোক না হোক তুমি বল।

রঞ্জু ইতস্তত করে বলল, আর সিগারেট খাব না। ওয়ার্ড অব অনার। মরদক বাত হাতিকা দাঁত।

তারা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুল সন্ধ্যার ঠিক আগে-আগে। বৃষ্টি নেই। নিয়ন আলোয় ভেজা রাস্তা চিকমিক করছে।

রঞ্জু বলল, রিকশা করে একটু ঘুরবে নীলু?

উঁহুঁ।

বেশ। চল রিকশা করে তোমাকে ঝিকাতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

হ্যাঁ, পরে কেউ দেখুক।

সন্ধ্যাবেলা কে আর দেখবে? একটা রিকশা ডাকি?

আচ্ছা ডাকো।

রিকশায় উঠতে গিয়ে রঞ্জু দেখল নীলুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সে দারুণ অবাক হয়ে গেল।

কী ব্যাপার নীলু?

খুব খারাপ লাগছে। কাল যদি ওরা আমাকে পছন্দ করে ফেলে?

রঞ্জু দরাজ গলায় হেসে উঠল— করুক না পছন্দ, আমরা কোর্টে বিয়ে করে ফেলব।

তারপর আমাকে তুলবে কোথায়, খাওয়াবে কী? দুটি টিউশনি ছাড়া আর কী আছে তোমার?

এম.এ. ডিগ্রিটা আছে । সাহস আছে। আর ...

আর কী?

আর আছে ভালোবাসা।

নীলু এবং রঞ্জু দুজনেই এবার একত্রে হেসে উঠল। রঞ্জু অত্যন্ত উৎফুল্ল ভঙ্গিতে আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীলু মৃদুস্বরে বলল, এই তোমার সিগারেট ছেড়ে দেয়া? ফেল এক্ষুনি।

এটাই লাস্ট ওয়ান।

উঁহুঁ।

রঞ্জু সিগারেট ছুড়ে ফেলল রাস্তায়।

পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে সন্ধ্যাবেলা কিন্তু তোড়জোড় শুরু হল সকাল থেকে। নীলুর বড়ভাই এই উপলক্ষে অফিসে গেলেন না। নীলুর ছোটবোন বিলুও স্কুলে

গেল না। এই বিয়ের যিনি উদ্যোক্তা— নীলুর বড়মামা, তিনিও সাতসকালে এসে হাজির। নীলু তার এই মামাকে খুব পছন্দ করে কিন্তু আজ যখন তিনি হাসিমুখে বললেন, কী রে নীলু বিবি, কী খবর? তখন নীলু শুকনো মুখে বলল, ভালো।

মুখটা এমন হাঁড়ির মতো করে রেখেছিস কেন? তোর জন্যে একটা শাড়ি এনেছি। দেখ তো পছন্দ হয় কি না।

শাড়ি কীজন্যে মামা?

আনলাম একটা ভালো শাড়ি। এই শাড়ি পরে সন্ধ্যাবেলা যখন যাবি ওদের সামনে ...।

নীলু নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে এল।

রান্নাঘরে নীলুর ভাবী রেহানা মাছ কুটছিল। কলেজ যেদিন ছুটি থাকে সেদিন নীলু রান্নায় সাহায্য করার নামে বসে-বসে গল্প করে। আজ নীলু দেখল রেহানা ভাবীর মুখ গম্ভীর। নীলু পাশে এসে বসতেই সে বলল, তোমার ভাই কাল রাতে আমাকে একটা চড় মেরেছে। তোমার বিশ্বাস হয় নীলু?

নীলু স্তম্ভিত হয়ে গেল। রেহানা বলল, তুমি বিয়ে হয়ে চলে গেলে আমার কেমন করে যে দিন কাটবে।

নীলু বলল, দাদাটা একটা অমানুষ। অভাবে-অভাবে এরকম হয়েছে ভাবী। তুমি কিছু মনে করো না।

না, মনে করব কী? আমার এত রাগটাগ নেই।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। রেহানা একসময় বলল, তোমার ভাই পাঁচ টাকা মানত করেছে। তোমাকে যদি ওদের পছন্দ হয় তবে পাঁচ টাকা ফকিরকে দিবে।

নীলু কিছু বলল না। রেহানা বলল, পছন্দ তো হবেই। তোমাকে পছন্দ না করলে কাকে করবে? তুমি কি আর আমার মতো? কত মানুষ যে আমাকে দেখল নীলু, কেউ পছন্দ করে না। শেষকালে তোমার ভাই পছন্দ করল। সুন্দরটুন্দর তো সে বুঝে না।

নীলু হেসে উঠল। রেহানা বলল, চা খাবে?

নীলু জবাব দিল না।

তোমাকে চা খাওয়াবার সুযোগ কি আর হবে? বড়লোকের বউ হবে। মামা বলেছিলেন ওদের নাকি দুটি গাড়ি। একটা ছেলেরা ব্যবহার করে, একটা বাড়ির মেয়েরা।

নীলু চুপ করে রইল। রেহানা বলল, ছেলের এক চাচা হাইকোর্টের জজ।

হাইকোর্টের জজ দিয়ে আমি কী করব ভাবী ?

তুমি যে কী কথা বল নীলু, হাসি লাগে।

দুপুর থেকে নীলুর দাদা গম্ভীর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হল। নীলু ভেবে পেল না এই সামান্য ব্যাপারে দাদা এত চিন্তিত হয়ে পড়েছে কেন। একটি ছেলে মোটা মাইনের একটা চাকরি করলে এবং ঢাকা শহরে তার ঘরবাড়ি থাকলেই এরকম করতে হয় নাকি?

অকারণে রেহানা নীলুর দাদার কাছে ধমক খেতে লাগল।

বললাম একটা ফুলদানিতে ফুল এনে রাখতে।

এই বুঝি ঘর পরিষ্কারের নমুনা?

টেবিলক্লথটাও ইস্ত্রি করিয়ে রাখতে পার নি?

নীলুর বড়মামা অনেকবার তাকে বুঝালেন কী করে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। নম্র ভঙ্গিতে চা এগিয়ে দিতে হবে। কিছু জিজ্ঞেস করলে খুব কম কথায় উত্তর দিতে হবে। নীলুর রীতিমতো কান্না পেতে লাগল। সাজগোজ করাবার জন্যে মামি এলেন বিকেলবেলা। সন্ধ্যা হবার আগেই নীলু সেজেগুজে বসে রইল।

সমস্ত ব্যাপারটি যেরকম ভয়াবহ মনে হয়েছিল সেরকম কিছুই হল না। ছেলের বাবা খুব নরম গলায় বললেন, কী নাম মা তোমার?

নীলাঞ্জনা।

খুব কাব্যিক নাম। কে রেখেছে?

বাবা।

তিনি আর কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নীলুর মামার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। ছেলে নিজেও এসেছিল। নীলু তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারল না। চা-পর্ব শেষ হবার পর নীলু যখন চলে আসছে তখন শুনল একজন ভদ্রমহিলা বলছেন, খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের। আগস্ট মাসে বিয়ে দিতে আপনাদের কোনো অসুবিধা আছে?

নীলুর কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রেহানা রান্নাঘরে বসে ছিল। নীলুকে দেখেই বলল, টিপটা ভেঙে দু-টুকরা হয়েছে। তোমার ভাই শুনলে কী করবে ভেবে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কী অলক্ষণ। ওমা কাঁদছ কেন, কী হয়েছে?

নীলু প্রায় দৌড়ে এসে তার ভাবীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল— ভাবী আমি রঞ্জু ভাইকে বিয়ে করব। আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়। তুমি দাদাকে বল ভাবী।

আ.মি? আমার সাহস হয় না। হায় রে কী করি। চুপ নীলু চুপ। ভালো করে সব ভাব। এক্ষুনি জানাজানির কী দরকার।

আমি ভাবতে পারি না ভাবী।

নীলু এ কয়দিন কলেজে যায় নি। দিন সাতেক পর যখন প্রথম গেল, ক্লাসের মেয়েরা অবাক হয় বলল, বড্ড রোগা হয়ে গেছিস তুই। অসুখবিসুখ নাকি?

সে চুপ করে রইল।

কেমন গোলগাল মুখ ছিল তোর, এখন কীরকম লম্বাটে হয়ে গেছে। কিন্তু বেশ লাগছে তোকে ভাই।

ক্লাসে মন টিকল না নীলুর । ইতিহাসের অনিল স্যার ঘুমপড়ানো সুরে যখন গুপ্ত ডায়ানিস্টি পড়াতে লাগলেন তখন ছাত্রীদের স্তম্ভিত করে নীলু উঠে দাঁড়াল।

স্যার আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে। বাসায় যাব।

অনিল স্যার অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বেশি খারাপ? সঙ্গে কোনো বন্ধুকে নিয়ে যাবে?

না স্যার, একাই যাব।

নীলু ক্লান্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে কলেজ গেটের সামনে রঞ্জু দাঁড়িয়ে আছে । শুকনো মুখ । হাতে একটা কাগজের ঠোঙা।

গত তিনদিন ধরে আমি রোজ একবার করে আসি তোমাদের কলেজে।

নীলু বলল, এই ক'দিন আসি নি, শরীর ভালো না।

দুজন পাশাপাশি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল। তারপর রঞ্জু হঠাৎ দাঁড়িয়ে থেমে বলল, আগস্ট মাসের ৯ তারিখে তোমার বিয়ে?

কে বলল?

কার্ড ছাপিয়েছ তোমরা। রেবার কাছে তোমার বিয়ের কার্ড দেখেছি।

নীলু চুপ করে রইল। রঞ্জু এত বেশি উত্তেজিত ছিল যে, সহজভাবে কোনো কথা বলতে পারছিল না। কোনোমতে বলল, কার্ড দেখেও আমার বিশ্বাস হয় নি। তুমি নিজের মুখে বল।

নীলু মৃদুস্বরে বলল, না সত্যি না। তোমাকেই বিয়ে করব আমি।

কবে?

আজই।

রঞ্জু স্তম্ভিত হয়ে বলল, তোমার মাথা ঠিক নেই নীলু।

মাথা ঠিক আছে। কোর্টে মানুষ কীভাবে বিয়ে করে আমি জানি না।

রঞ্জু বলল, চল আমার মেসে। কী হয়েছে সবকিছু শুনি।

সে নীলুর হাত ধরল।

রঞ্জুর নয়া পল্টনের মেসে নীলু আগে অনেকবার এসেছে। দুপুরের গরমে বসে অনেক সময় গল্প করে কাটিয়েছে কিন্তু আজকের মতো কুলকুল করে ঘামে নি কখনো। রঞ্জু বলল, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নীলু, বড্ড ঘামছ।

আমার কিছু হয় নি।

চা খাবে? চা দিতে বলব?

উঁহুঁ। পানি খাব।

রঞ্জু পানির গ্লাস নিয়ে এসে দেখে নীলু হাত-পা এলিয়ে বসে আছে। চোখ ঈষৎ রক্তাভ। পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সে ভাঙা গলায় বলল,

রেবা তোমাকে আমার বিয়ের কার্ড দেখিয়েছে?

হুঁ।

আর কী বলেছে সে?

বলেছে, তোমাকে নাকি ফরসা মতন রোগা একটি ছেলের সঙ্গে দেখেছে।

নীলু বলল, ওর নাম জমশেদ। ওর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে আমার।

রঞ্জু কিছু বলল না।

নীলু বলল, ঐ ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তুমি কী করবে ?

কী করব মানে ?

নীলু ভীষণ অবাক হয়ে বলল, কিছু করবে না তুমি?

তোমার শরীর সত্যি খারাপ নীলু। তুমি বাসায় যাও। বিশ্রাম কর।

নীলু রিকশায় উঠে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি তোমার সঙ্গে আসব? বাসায় পৌঁছে দেব?

উঁহুঁ।

নীলু বাসায় পৌঁছে দেখে অনেক লোকজন । হিরণপুর থেকে খালারা এসেছেন। বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে তুমুল হইচই। নীলু আলগাভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সন্ধ্যায় চা খেতে বসে সেজো খালার হাসির গল্প শুনে উঁচু গলায় হাসল। কিন্তু রাতের বেলা অন্যরকম হল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নীলু গিয়ে তার দাদার ঘরে ধাক্কা দিল। রেহানা বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে নীলু?

নীলু ধরা গলায় বলল, বড় কষ্ট হচ্ছে ভাবী।

রেহানা নীলুর হাত ধরল। কোমল স্বরে বলল, ডাকব তোমার দাদাকে? কথা বলবে তার সাথে?

ডাকো।

নীলুর দাদা সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে এলেন। অবাক হয়ে বললেন, কী রে নীলু কিছু হয়েছে?

নীলু বলল, কিছু হয় নি দাদা। তুমি ঘুমাও।

তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

নন্দিনী

মজিদ বলল, চল্ তোকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই।

বেশ রাত হয়েছে। চারদিকে ফিনফিনে কুয়াশা। দোকানপাট বন্ধ। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পাড়াগাঁর শহরগুলিতে আগেভাগে শীত নামে। মজিদ বলল, পা চালিয়ে চল। শীত কম লাগবে।

কোথায় যাবি?

চল্ না দেখি। জরুরি কোনো কাজ তো তোর নেই। নাকি আছে?

না নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তা ছেড়ে ইট বিছানো সরু রাস্তায় এসে পড়লাম। শহর অনেক বদলে গেছে। আগে এখানে ডালের কারবারিরা বসত। এখন জায়গাটা ফাঁকা। পিছনেই ছিল কার্তিকের 'মডার্ন সেলুন'। সেখানে দেখি একটা চায়ের স্টল। শীতে গুটিশুটি মেরে লোকজন চা খাচ্ছে। আমি বললাম, এক দফা চা খেয়ে নিবি নাকি মজিদ?

উঁহুঁ, দেরি হয়ে যাবে।

শহরটা বদলে গেছে একেবারে। মহারাজের চপের দোকানটা এখনো আছে?

আছে।

হাঁটতে-হাঁটতে ধর্মতলা পর্যন্ত চলে এলাম। ধর্মতলার গা ঘেঁষে গিয়েছে হাড়িখাল নদী । আমি আর মজিদ গোপনে সিগারেট টানবার জন্যে কতবার হাড়িখালের পাড়ে এসে বসেছি। কিন্তু এখন নদীটদী কিছু চোখে পড়ছে না।

নদীটা কোথায় রে মজিদ? হাড়িখাল এইদিকেই ছিল না?

ঐ তো নদী। সাবধানে আয়।

একটা নর্দমার মতো আছে এখানে। পা পিছলে পড়েই গিয়েছিলাম। সামলে উঠে দেখি নদী দেখা যাচ্ছে। আমরা নদীর বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। সরু ফিতের মতো নদী অন্ধকারেও চিকমিক করছে। আগে এখানে এরকম উঁচু বাঁধ ছিল না । নদীর ঢালু পাড়ে সরষের চাষ হত। মজিদ চুপচাপ হাঁটছিল।

আমি বললাম, আর দূর কত?

ঐ দেখা যাচ্ছে।

কার বাড়ি?

আয় না চুপচাপ। খুব সারপ্রাইজড হবি।

একটি পুরনো ভাঙা দালানের সামনে দুজন থমকে দাঁড়ালাম। বাড়ির চারপাশ ঝোপঝাড়ে অন্ধকার হয়ে আছে। সামনের অপরিচ্ছন্ন উঠোনে চার-পাঁচটা বড়-বড় কাগজি লেবুর গাছ। লেবুর গন্ধের সঙ্গে খড়-পোড়ানো গন্ধ এসে মিশেছে। অসংখ্য মশার পিনপিনে আওয়াজ। মজিদ খটখট করে কড়া নাড়তে লাগল। ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কেউ একজন বলল, কে?

মজিদ আরো জোরে কড়া নাড়তে লাগল। হারিকেন হাতে একটি লম্বা রোগামতো শ্যামলা মেয়ে দরজা খুলে দিল। মজিদ বলল, কাকে নিয়ে এসেছি দেখ।

আমি কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মেয়েটি হাসিমুখে বলল, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন তো? আমি নন্দিনী।

আমি মাথা নাড়লাম।

আপনি কবে দেশে ফিরেছেন?

দু-মাস হবে। এতদিন ঢাকায় ছিলাম। এখানে এসেছি গতকাল।

মজিদ বিরক্ত হয়ে বলল, ভিতরে আয় না। ভিতরে এসে বস্।

ঘরের ভিতরটা বেশ গরম। একটি টেবিলে কাচের ফুলদানিতে গন্ধরাজ ফুল সাজানো। চৌকিতে ধবধবে শাদা চাদর বিছানো। ঘরের অন্য প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা ইজিচেয়ার। মজিদ গা এলিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল। হালকা গলায় বলল, চিনি এনেছি। একটু চা বানাও ।

নন্দিনী হারিকেন দুলিয়ে চলে গেল। আমরা দুজন অন্ধকারে বসে রইলাম। মজিদ ফস করে বলল, সারপ্রাইজড্ হয়েছিস নাকি?

হুঁ।

কেমন দেখলি নন্দিনীকে?

ভালো।

শুধু ভালো? ইজ নট শী ওয়ান্ডরফুল ?

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে বললাম, এই বাড়িতে আর কে থাকে?

সবাই থাকে।

সবাই মানে?

মজিদ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুই একবার নন্দিনীকে প্রেমপত্র লিখেছিলি না? অনেক কবিতাটবিতা ছিল সেখানে। তাই না?

আমি শুকনো গলায় বললাম, বাদ দে ওসব পুরানো কথা।

মজিদ টেনে-টেনে হাসতে লাগল।

পরের দশ মিনিট দুজনেই চুপ করে রইলাম। মজিদ একটির পর একটি সিগারেট টানতে লাগল। মাঝে-মাঝে হাসতে লাগল আপন মনে।

অনেকক্ষণ আপনাদের অন্ধকারে বসিয়ে রাখলাম। ঘরে একটা মোটে হারিকেন। কী যে করি!

নন্দিনী চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল।

চিনি হয়েছে চায়ে?

কাপে চুমুক দিয়ে মজিদ বিষম খেয়ে কাশতে লাগল। আমি বললাম, আপনাদের এদিকে খুব হাওয়া তো।

হুঁ নদীর উপরে বাড়ি। হাওয়ার জন্যে কুপি জ্বালানোই মুশকিল।

ভেতর থেকে কে একজন ডাকল, বউ ও বউ।

নন্দিনী নিঃশব্দে উঠে গেল। আমি বললাম, তুই প্রায়ই আসিস এখানে?

আসি।

ব্যাপার কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

আমি চুপ করে রইলাম। মজিদ বলল, রাত হয়ে যাচ্ছে, এইবার ফিরব। নন্দিনীকে কেমন দেখলি বল্ না শুনি।

ভালো। আগের মতোই, একটুও বদলায় নি।

নন্দিনী আমাদের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ততক্ষণে চাঁদ উঠে গেছে। ম্লান জোছনায় চারদিক কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। মজিদ বলল, যাই নন্দিনী।

নন্দিনী কিছু বলল না। হারিকেন উঁচু করে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে রইল। আমরা ধর্মতলা পর্যন্ত নিঃশব্দে হাঁটলাম। একসময় মজিদ বলল, কলেজের ফেয়ারওয়েলে নন্দিনী কোন্ গানটা গেয়েছিল মনে আছে?

না মনে নেই।

আমার আছে।

মজিদ গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাঁজতে থাকল। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, জানিস, নন্দিনীকে আমিই এ বাড়িতে এনে তুলেছিলাম।

তাই নাকি?

ওর বাবাকে তখন মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে।

সুরেশ্বর বাবুকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছিল নাকি?

মারবে না তো কী করবে? তুই কী যে কথা বলিস। মেরে তো সাফ করে ফেলেছে এদিকে।

আমি বললাম, সুরেশ্বর বাবু একটা গাধা ছিলেন। কত বললাম— মিলিটারি আসবার আগেই পালান। না পালাবেন না, একটামাত্র মেয়ে সঙ্গে নিয়ে হুস করে চলে যাবে, তা না ....।

মজিদ একদলা থুতু ফেলে বলল, নন্দিনী তখন এসে উঠেছে হারুনদের বাসায়। হিন্দু মেয়েদের সে সময় কে জায়গা দেবে বল্? কী যে মুশিবত হল! কতজনের বাড়িতে গিয়ে হাতজোড় করে বলেছি, এই মেয়েটিকে একটু জায়গা দেবেন। এর বড় বিপদ। কেউ রাজি হয় না। শেষকালে আজিজ মাস্টার রাজি।

আজিজ মাস্টার কে?

এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের টিচার।

মজিদ একটি সিগারেট ধরাল। ঘন-ঘন ধোঁয়া টেনে কাশতে লাগল। আমি বললাম, পা চালিয়ে চল, বেশ রাত হয়েছে।

মজিদ ঠাণ্ডা সুরে বলল, নন্দিনী আজিজ মাস্টারের কাছে কিছুতেই থাকতে চায় নি। বারবার বলেছে— 'আপনি তো ইন্ডিয়া যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। পায়ে পড়ি আপনার।' আমি ধমক দিয়ে বলেছি, তুমি হিন্দু মেয়ে মুসলমান ছেলের সঙ্গে যাবে, পথেঘাটে গিজগিজ করছে মিলিটারি। নন্দিনী কী বলেছিল জানিস?

কী?

আন্দাজ করতে পারিস কিছু?

আমি কথা বলার আগেই মজিদ চাপা গলায় বলল, নন্দিনী বলেছে, বেশ তাহলে আপনার বউ সেজে যাই। নাহয় আপনি আমাকে বিয়ে করুন।

মজিদ একদলা থুতু ফেলল। আমি বললাম, আজিজ খাঁ বুঝি বিয়ে করেছে একে?

হ্যাঁ।

আজিজ খাঁ কোথায়? তাকে তো দেখলাম না।

ও শালাকে দেখবি কী করে? ও মুক্তিবাহিনীর হাতে মরেছে। দালাল ছিল

শালা। হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে বিয়ে করেছে। বুঝতে পারছিস না? আর নন্দিনী কিনা তার বাড়িতেই মাটি কামড়ে পড়ে রইল। হারামজাদী।

আমি চুপ করে রইলাম। মজিদ দাঁড়িয়ে পড়ল। অকারণেই গলা উঁচিয়ে বলল, মেয়ে মানুষের মুখে থুতু দেই। তুই হারামজাদী ঐ বাড়িতে পড়ে আছিস কীজন্যে? কী আছে ঐ বাড়িতে? জোর করে তোকে বিয়ে করেছে, আর তুই কিনা ছিঃ ছিঃ!

দুজনে বাঁধ ছেড়ে শহরের প্রশস্ত পথে উঠে এলাম। বড় রাস্তাটা বটগাছ পর্যন্ত গিয়ে বেঁকে গেছে ডানদিকে। এদিকেই সুরেশ্বর বাবুর বাড়ি ছিল। আমি আর মজিদ সেই বাড়ির সামনে শুধুমাত্র নন্দিনীকে এক নজর দেখবার জন্যে ঘুরঘুর করতাম। কোনো কোনো দিন সুরেশ্বর বাবু অমায়িক ভঙ্গিতে ডাকতেন— আরে-আরে তোমরা যে। এসো, এসো চা খাবে। মজিদ হাতের সিগারেট কায়দা করে লুকিয়ে ফেলে বলত, আরেক দিন আসব কাকা।

মজিদ নিঃশব্দে হাঁটছিল। আমি ডাকলাম, এই মজিদ।

কী?

চুপচাপ যে?

শীত করছে।

সে কান পর্যন্ত চাদর তুলে দিয়ে ফিস-ফিস করে বলল, জানিস আমি আর নন্দিনী একটা গোটা রাত নৌকায় ছিলাম। রাতের অন্ধকারে আজিজ খাঁর বাড়িতে নৌকা করে ওকে রেখে এসেছিলাম। খুব কাঁদছিল সে। আমি ওর ঘাড়ে একটা চুমু খেয়েছিলাম। মজিদ হঠাৎ কথা থামিয়ে কাশতে লাগল। আমি চারদিকের গাঢ় কুয়াশা দেখতে লাগলাম।

গোপন কথা

আজ আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

আলো তখনো ভালো করে ফোটে নি। এখনো অন্ধকার গাঢ় হয়ে আছে। আকাশে ক্ষীণ আলো-আঁধারিতে মন অন্যরকম হয়ে যায়। পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

আমি পৃথিবীর সবাইকে ভালোবেসে ফেল্লাম। আমার পাশের চৌকিতে বাকের সাহেব ঘুমিয়ে । অন্ধকারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। তবু আমি নিশ্চিত জানি তিনি একটি কুৎসিত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছেন। মুখের লালায় তাঁর বালিশ ভিজে গেছে। লুঙি উঠে গেছে কোমরে। তাতে কিছু যায় আসে না। আজ আমার চোখে অসুন্দর কিছু পড়বে না, বাকের সাহেবকেও আমি ভালোবাসব।

বৎসরের অন্য দিনগুলি আজকের মতো হয় না কেন?— ভাবতে-ভাবতে আমি সিগারেট ধরালাম। হিটার জ্বালিয়ে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল নিঃশব্দে। তবু বাকের সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জড়ানো গলায় বললেন, চা হচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ।

আজ এত ভোরে উঠলেন যে, ব্যাপার কী? শরীর খারাপ নাকি?

জি না। চা খাবেন বাকের সাহেব?

দেন এক কাপ।

এই বলেই মাথা বের করে তিনি নাক ঝাড়লেন। নাক মুছলেন মশারিতে— কী কুৎসিত ছবি। আজ চমৎকার সব ছবি দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলাম বাকের সাহেব নামে এ ঘরে কেউ থাকে না এবং এটা যেন-তেন ঘরও নয়। এটাই হচ্ছে মহিমগড়ের রাজবাড়ি এবং আমি এসেছি মহিমগড়ের

রাজকন্যার অতিথি হয়ে। আর আমিও কোনো হেজিপেজি লোক নই। আমি একজন কবি। আজ সন্ধ্যায় মহিমগড়ের রাজকন্যাকে আমি কবিতা শোনাব।

মঞ্জু সাহেব।

জি বলুন।

এরকম লাগছে কেন আপনাকে? কিছু হয়েছে নাকি?

না, কী হবে?

দেখি, একটা সিগারেট দেন দেখি।

বাকের সাহেব তাঁর সাপের মতো কালো রোগা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। একটা সিগারেট দিলাম। অথচ আমি নিশ্চিত জানি, বালিশের নিচে তাঁর নিজের সিগারেট আছে। বাকের সাহেব নিজের সিগারেট কমই খান। আহ, কী সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভাবছি। আজ আমি একজন অতিথি-কবি। আমার চিন্তাভাবনা হবে কবির মতো। আমি নরম স্বরে ডাকলাম, বাকের সাহেব।

জি।

আজ আমার কেন জানি বড় ভালো লাগছে।

ভালো লাগার কী হল আবার?

বাকের সাহেব বড়ই অবাক হলেন। তাঁর কাছে আজকের দিনটি অন্য সব দিনের মতোই। সাধারণ। ক্লান্তিকর। আমি মৃদুস্বরে ডাকলাম, বাকের সাহেব।

বলেন।

আজ আমার জন্মদিন।

তাই নাকি?

জি। এগারোই বৈশাখ।

আম-কাঁঠালের সিজনে জন্মেছেন রে ভাই।

এই বলেই বাকের সাহেব চায়ের কাপ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। আজ আমি রাগ করব না। চমৎকার একটি সকালকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। সন্ধ্যাবেলা যাব নীলুদের বাড়ি । সন্ধ্যা হবার আগে পর্যন্ত শুধু ওর কথাই ভাবব।

বাকের সাহেব বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললেন, 'পাইখানা কষা হয়ে গেছে ভাই।'

আমি শুনেও না-শোনার ভান করলাম। আজ আমি অসুন্দর কিছুই শুনব না। আজ আমার জন্মদিন। আজ নীলুদের বাসায় যাব এবং তাকে গোপন কথাটি বলব।

ঝড় হোক। বৃষ্টি হোক। কিংবা প্রচণ্ড টর্নেডো হোক। কিছুই আসে যায় না। আজ সন্ধ্যায় আমি ঠিকই যাব নীলুদের বাসায়। নীলুর বাবা হয়তো বসে থাকবেন

বারান্দায়। তিনি আজকাল বেশিরভাগ সময় বারান্দাতেই থাকেন। অপরিচিত কাউকে দেখলে কপালের চামড়ায় ভাঁজ ফেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। আমার দিকেও তাকাবেন। আমি হাসিমুখে বলব, 'নীলুফার কি বাসায় আছে? ওর সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।' আমি উত্তেজিত অবস্থায় ঠিকমতো কথা বলতে পারি না। কথা গলায় আটকে যায়। কিন্তু আজ আমার কোনো অসুবিধা হবে না । আজ কথা বলব অভিনেতাদের মতো।

চা শেষ করেই বাকের সাহেব ঘুমুবার আয়োজন করলেন। গলা টেনে বলেন, 'ন'টা পর্যন্ত ঘুমাব। তারপর উঠে নাশতা খেয়ে আবার ঘুম । ছুটির দিনের ঘুম কাকে বলে, দেখবেন। ম্যারাথন ঘুম। হা-হা-হা।' কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিশ্বাস ভারী হয়ে এল। বারান্দায় এসে দেখি আলো ফুটছে। আকাশ হালকা নীল। পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। গোপন কথা বলার জন্যে এরচে সুন্দর দিন আর হবে না।

সকাল এগারোটায় টেলিফোন করলাম। নীলুকে টেলিফোনে কখনো পাওয়া যায় না। আজ পাওয়া গেল। নীলু কিশোরীদের মতো গলায় বলল, কে কথা বলছেন?

আমি মঞ্জু ।

ও, মঞ্জু ভাই। আপনি কেমন আছেন?

ভালো । তুমি কেমন আছ নীলু?

আমিও ভালো।

কী করছিলে?

পড়ছিলাম । আবার কী করব? আমার অনার্স ফাইন্যাল না?

ও তাই তো। আচ্ছা শোন নীলু , তুমি কি আজ সন্ধ্যায় বাসায় থাকবে?

থাকব না কেন?

আমি একটু আসব তোমাদের ওখানে।

বেশ আসুন।

একটা কথা বলব তোমাকে।

কী কথা।

গোপন কথা।

আপনার আবার গোপন কথা কী?

নীলু খিল-খিল করে হাসতে লাগল। কী সুন্দর সুরেলা হাসি । কী অদ্ভুত লাগছে শুনতে।

হ্যালো নীলু।

বলুন শুনছি। আজ সন্ধ্যায় আসব।

বেশ তো আসুন। রাখলাম এখন। নাকি আরো কিছু বলবেন?

না, এখন আর কিছু বলব না।

নীলু রিসিভার নামিয়ে রাখার পরও আমি অনেকক্ষণ রিসিভার কানে লাগিয়ে রইলাম।

মাত্র এগারোটা বাজে। আরো আট ঘণ্টা কাটাতে হবে। কোথায় যাওয়া যায়? কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। নিউমার্কেটে কিছুক্ষণ হাঁটলাম একা একা। এবং একসময় দামি একটা শার্ট কিনে ফেললাম। অন্যদিন হলে শার্টের দাম আমার বুকে বিঁধে থাকত। আজ থাকল না। দামের কথা মনেই রইল না।

দশটি ফাইভ ফাইভ কিনলাম এ্যালিফেন্ট রোড থেকে। অন্তত আজকের দিনটিতে দামি সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। নীলুর জন্য কিছু-একটা উপহার নিয়ে গেলে হয় না? কী নেয়া যায়? সুন্দর মলাটের একটা কবিতার বই। সেখানে খুব গুছিয়ে একটা কিছু লিখতে হবে যেমন, "নীলুকে— দেখা হবে চন্দনের বনে।" বইটি দেয়া হবে ফিরে আসার সময়। নীলু নিশ্চয়ই আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসবে। তখন বলব, 'নীলু, আজ কিন্তু আমার জন্মদিন।' নীলু বলবে, ওমা আগে বলবেন তো?

আগে বললে কী করতে?

কোনো উপহার টুপহার কিনে রাখতাম।

কী উপহার?

কবিতার বইটই।

আমি তো কবিতা পড়ি না।

না পড়লেও বই উপহার দেয়া যায়। ঠিক এই সময় আমি মোড়ক খুলে বইটি হাতে দিয়ে অল্প হাসব। হাসতে-হাসতেই বলব, আমি তোমার জন্য একটা কবিতার বই এনেছি নীলু।

সন্ধ্যাবেলা আকাশে খুব মেঘ করল। এবং একসময় শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাস বইতে শুরু করল। নীলুদের বারান্দায় পা রাখামাত্র সত্যি-সত্যি ঝড় শুরু হল। কারেন্ট চলে গেল। সমস্ত অঞ্চল ডুবে গেল অন্ধকারে। নীলু আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এসেছেন? ভিজে গেছেন দেখি। আসুন, ভেতরে আসুন। কী যে কাণ্ড করেন? কাল এলেই হত।

বসার ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। একজন বুড়োমতো ভদ্রলোক বসে আছেন।

তার পাশে বিলু। বিলু আমাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, স্যার ভূতের গল্প বলছেন। উফ যা ভয়ের। তারপর স্যার বলুন।

নীলু বলল, দাঁড়ান স্যার আমি এসে নেই। চায়ের কথা বলে আসি।

নীলু চায়ের কথা বলে এল। একটা তোয়ালে আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, মাথা মুছে ফেলুন। তারপর স্যারের গল্প শুনুন। প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স। বানানো গল্প না।

তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল নীলু।

দাঁড়ান গল্প শুনে নেই।

আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

তাই নাকি?

কৃষি ব্যাংকে একটা চাকরি হয়েছে। ফিফথ গ্রেড অফিসার।

বাহ্ বেশ তো। আসুন এখন গল্প শুনুন।

নীলু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল— স্যার ইনি হচ্ছেন আমার বড়ভাইয়ের বন্ধু। যে ভাই ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে থাকেন তাঁর।

নীলুর স্যার বললেন, 'বসুন'। আমি বসলাম। ভদ্রলোক সঙ্গে-সঙ্গে গল্প শুরু করলেন ঃ পথ-ঘাট অন্ধকার । শ্রাবণ মাস। আকাশে খুব মেঘ করেছে। আমি আর আমার বন্ধু তারাদাস পাশাপাশি যাচ্ছি। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। যেন কেউ একজন ছুটতে-ছুটতে আসছে। তারাদাস বলল, 'কে? কে?' তখন শব্দটা থেমে গেল।

ভদ্রলোক ভালোই গল্প করতে পারেন। নীলু-বিলু মুগ্ধ হয়ে শুনছে। নীলু একটা শাড়ি পরেছে। পরার ভঙ্গিটির মধ্যে কিছু-একটা আছে। তাকে বিলুর চেয়েও কমবয়স্ক লাগছে। যেন সিক্স-সেভেনে পড়া বালিকা শখ করে শাড়ি জড়িয়েছে।

গল্প শেষ হতে অনেক সময় লাগল। নীলু উঠে গিয়ে চা নিয়ে এল। আমি বললাম, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

নীলু অবাক হয়ে বলল, একবার তো বলেছেন।

কী বললাম?

কৃষি ব্যাংকে চাকরি নিয়ে ময়মনসিংহ যাচ্ছেন।

এ কথা না। অন্য একটা কথা।

ঠিক আছে বলবেন। দাঁড়ান স্যারের কাছ থেকে আরেকটা গল্প শুনি। স্যার আরেকটা গল্প বলুন।

ভদ্রলোক গল্প বলার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন। গল্প হতে-হতে অনেক রাত হয়ে গেল। বৃষ্টিও কিছুটা কমে এসেছে। নীলু ব্যস্ত হয়ে তাদের ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলল।

আমি স্যারের পাশে বসলাম। নীলু হালকা গলায় বলল, আবার আসবেন মঞ্জু ভাই।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই বিলুর স্যার বললেন, 'আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন?' আমি তার জবাব দিলাম না। ভূতে বিশ্বাস করি কি না করি তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি পরশু দিন চলে যাব। অনেকদিন আর ঢাকায় আসা হবে না। আর এলেও গোপন কথা বলার ইচ্ছা হবে না হয়তো। বিলুর স্যার বললেন, পৃথিবীতে অনেক স্ট্রেঞ্জ ঘটনা ঘটে বুঝলেন মঞ্জু সাহেব, নাইনটিন সিক্সটিতে একবার কী হয়েছে শুনেন ...।

আরেক দিন শুনব। আজ আমার মাথা ধরেছে।

আমাদের এদিকেও বাতি নেই। অন্ধকার ঘরে বাকের সাহেব শুয়ে আছেন। আমাকে ঢুকতে দেখেই ক্লান্ত স্বরে বললেন, শরীরটা খারাপ করেছে ভাই। বমি হয়েছে কয়েকবার। একটু সাবধানে আসেন, পরিষ্কার করা হয় নাই।

সব পরিষ্কার করে ঘুমুতে যেতে আমাদের অনেক রাত হল। বাইরে আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাকের সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, ঘুমালেন নাকি ভাই?

জি না।

আপনার জন্মদিন উপলক্ষে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছিলাম। গরিব মানুষ, কী আর দিব বলেন।

বাকের সাহেব অন্ধকারে এগিয়ে দিলেন সিগারেটের প্যাকেটটি। আমি নিচু স্বরে বললাম, একটা কথা শুনবেন?

কী কথা?

গোপন কথা। কাউকে বলতে পারবেন না।

বাকের সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আজ বোধহয় পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে গোপন কথাটি বলা হয় নি সেটি আমি বলতে শুরু করলাম। আমার ভালোই লাগল।